সিঁড়ি

রতনকুমার ঘোষ

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫-২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ
রূপরেখা প্রেস :
৩৩-ডি মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা-৬

॥ মূল্য : তিন টাকা মাত্র ॥

নাট্যকারের নিবেদন

সিঁড়ি প্রকৃতপক্ষে উত্তবণের প্রতীক। নীচু থেকে উঁচুতে; অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে জীবনে। অহরহ মানুষ সেই উত্তরণের সাধনা করে চলেছে,—জেনে অথবা না জেনেই।

কিন্তু এ-জন্য রক্তক্ষয়েব প্রয়োজনও কম নয়। অনায়াস চেষ্টায় আজ অবধি কোন উত্তরণই ঘটেনি। ঘটতে পারেও না।

আজকের মানুষেব জীবনে এ-কথা আরও সত্য। কারণ, আজকের প্রতিটি মানুষই বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত, ক্লান্ত, পীড়িত। আমরা আজ একজন অপরজনকে চিনি না। একে অন্যকে জানি না। নাড়ীব সম্পর্কের মধ্যেও এমনি পাবস্পরিক অপরিচয়। চাবিদিককার এই অপরিচয়ের মধ্যেও গোটা মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় খুঁজে পাওয়া প্রকৃতই দুষ্কব। এবং কঠিন তাদেব উত্তরণের হদিশ পাওয়া।

আমরা যা দেখি তা খণ্ডচিত্র মাত্র। যতটুকু জানি তার মধ্যে অনুক্ত থেকে যায় বহু কিছু। তবু সেই খণ্ডচিত্রকে অখণ্ডরূপে চিত্রিত করতে চেষ্টা করি আমরা।

আজকেব দিনে প্রতিটি মানুষের জীবন তাই নাট্যকারদের কাছে এক চ্যালেঞ্জ বিশেষ। মানুষের যে প্রকাণ্ড মিছিল চলেছে তার মধ্যে সম্পূর্ণ মানুষ কোনভাবেই দৃশ্যমান নয়। অথচ আমার দায়িত্ব পরিপূর্ণ মানুষ মঞ্চে উপস্থিত করা। দর্শকের সঙ্গে তার পবিচয় করিয়ে দেওয়া। তার অতীত এবং বর্তমানকে তুলে ধরা; সর্বশেষে, তার ভবিষ্যত সম্পর্কে বিশ্বাস্ত ইঙ্গিত দেওয়া।

এবং আমরা সেটা করে আসছি। বেশ মনোরম অথবা গরম গরম শব্দে বাক্য-রচনা করে দীর্ঘ মিছিলের সেই বিশেষ মানুষটিকে পৃথক করে দর্শকের সামনে দাঁড় করাচ্ছি। যা দেখিনি তাই দেখাচ্ছি, যা শুনিনি তাই শোনাচ্ছি। সর্বোপরি—সে যা নয় তাই তাকে করে তুলছি।

কিন্তু এ ফাঁকিবাজির আয়ু কতক্ষণ?

আজকের দর্শক ধরে ফেলেছে সেই মনগড়া কাহিনীর ফাঁকিবাজি। তারা বলছে 'না, তোমার কাহিনী সত্যি নয়। যাকে আমাদের সামনে এনে দাড় করিয়েছ—ওকে তোমার চাইতে আমরা বেশি জানি, চিনি, বুঝি। তোমার মনগড়া কথা না বলে—ওর যা দেখেছ—তাই বলো।'

দর্শকের এই সোচ্চার দাবী আজ য়ুরোপ-আমেরিকার প্রেক্ষাগৃহে ধ্বনিত। নাট্যকারকেও দর্শকের এই দাবী বৈধ বলে স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। এবং নাটকের বৃহৎ অংশ দর্শকের অনুভবের ওপর ছেড়ে দিয়ে নাট্যকারকে নতুন প্রথায় নাটক রচনা করতে হচ্ছে।

সিঁড়ি নাটকটি মোটামুটি একটি সকালে সুরু; পরবর্তী সকালে শেষ। অপরাহ্নে একবার অন্ধকারের সংকেতে বিরতির ইঙ্গিত দেওয়া যায়।

নাটকটির দৃশ্যপট বলতে মাত্র একটি আধভাঙা ঘর; যা বাসোপযোগী নয়। পরিত্যক্ত, শ্রীহীন এবং অগোছাল। ঘরের পেছনে জনপথ। প্রেক্ষাগৃহটি যেন নাটকের দৃশ্যপট ঐ ঘরেরই অন্তর্গত। উপকরণ বলতে একখানি আধভাঙা খাটিয়া; জলের কুঁজো; একটি

গাছের গুঁড়ি। এ ছাড়া হাতুড়ি, বাটাল, ছেনি ইত্যাদি কয়েকটি টুকিটাকি জিনিস।

নাটকে নায়ক দুজন। একজন বৃদ্ধ—যিনি নাটকে 'লোকটা'। দ্বিতীয় নায়ক—একজন যুবক—নাম রঞ্জন। নায়িকা সোনালী। যুবতী। লোকটা, রঞ্জন এবং সোনালী—এদের বিগত জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন। ওদের বাচনিক যা জানা যাবে—নাট্যকারের ওরা ততটুকুই চেনা —বেশি নয়।

ওরা যা বলছে তাতে বোঝা যাচ্ছে ওদের বুকের গভীরে নিদারুণ এক যন্ত্রণা প্রবহমান। কিন্তু কেন সেই যন্ত্রণার উদ্ভব, তার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই। ওরা অনেক কথা বলতে গিয়েও থেমে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বক্তব্য শেষ হচ্ছে না আদপেই। যেন ওরা ঘটনার ক্রীতদাস। অবস্থার ক্রীড়নক।

তবু ওরা সম্পূর্ণ। ওদের জীবনের এই খণ্ডচিত্রের মধ্যেই ওরা এক অখণ্ড জীবনের ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে। যার প্রকৃত সমঝদার দর্শক-সমাজ। নাট্যকার নয়। কারণ এ নাটকে নাট্যকার অনুলেখক মাত্র। বক্তা নয় একেবারেই।

* * * *

সিঁড়ি নাটকে সঙ্গীত ব্যবহারের বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকতে হবে। দীর্ঘ অভ্যাসাশ্রয়ী প্রচলিত সঙ্গীতের প্রয়োগ না করে—পরিবেশানুযায়ী বিভিন্ন শব্দের সাহায্য নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। নাটকের সুরু এবং শেষে—বিউগিল-ড্রাম বাজিয়ে জীবনের মিছিল এই বিশেষ ইঙ্গিত নাটকের পক্ষে অপরিহার্য।

লোকটা, রঞ্জন এবং সোনালী—জীবনের পাশাখেলায় পরাজিত সত্যি; কিন্তু ওরা হার স্বীকার করে নিতে একেবারেই নারাজ।

ওর' বিমর্ষ হলেও মবিভ নয়। ক্লান্ত যদিও তবু বসে পড়তে অনিচ্ছুক। সমাজের দেওয়া একরাশ অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়েও ওরা যেন বেপরোয়া, সপ্রতিভ এবং চলমান। মূলতঃ ওরা তিনজন—পাপ, ঘৃণা আব অসম্মান। ওরা তিনজনেই এক অনির্দেশ্য নিয়তির ইঙ্গিতে একটি ঘরের মধ্যে আট্‌কা পড়েছে। আর বাকী পৃথিবী উন্মত্ত হিংসা নিয়ে ঘিরে ধরেছে সেই ঘর। বেরিয়ে যাবার পথ নেই ওদের। শেষরাতের সেই ভয়ংকর মুহূর্তে তিনটি অপরিচিত মানুষ হঠাৎ আবিষ্কার করল—ওরা একে অন্যের পরিপূরক। যখন ওরা পরস্পর পরিচিত হোল—তখন বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মতো একটিমাত্র পথে হিংসায় উন্মত্ত সমাজ বদ্ধমুষ্টিতে দণ্ডায়মান।

ওরা এবার আর সমাজের ক্রীতদাস হোল না। ঘরের তৈরি করা ছোট্ট দরজা বন্ধ রইল। নতুন পথে উত্তরণ ঘটলো রঞ্জন, সোনালী আর লোকটার।

এবং এবার ওদের অভিনন্দন জানালো—জনপথের চলমান জীবনেব মিছিল।

রতনকুমার ঘোষ

অভিনয়ের আগে অন্তত পত্রালাপের জোজন্য আশা রাখি

নাট্যকার

চরিত্র-লিপি

লোকটা ॥ একজন বৃদ্ধ। এককালে শক্তিমান, এখন ভঙ্গুর, ক্লান্ত, বিরক্ত এবং বিষণ্ণ। নিজের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস। প'ড়ো ভাঙা ঘরের একক বাসিন্দা।

রঞ্জন ॥ যুবক। সুন্দর, সপ্রতিভ, সতেজ এবং সোচ্চার। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে এই ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়া কয়েকদণ্ডের মানুষ। মাঝে মাঝে বিদ্রোহী, কঠিন ও ঋজু। কখনো ক্রুদ্ধ, কখনো হাস্যময়—লঘু ও চপল।

পরমেশ ॥ স্থূলদেহী শ্লেষ্মা পীড়িত প্রৌঢ়। বয়সের অনুপাতে ভারী দেহ। কামুক, মাতাল এবং অর্থবান

হরনাথ ॥ খিটখিটে মেজাজের প্রৌঢ়। দাম্ভিক, প্রগলভ, ক্ষমতা-লোলুপ মানুষ। লোকটার প্রতিবেশী। উঁচুতলার মানুষ।

পুলিশ ॥ একজন অবাঙালী পুলিশ।

প্রথম
দ্বিতীয় } ॥ পথ চলতি কয়েকজন মানুষ।
তৃতীয়

জনতা, পুলিশ অফিসার, আরও কেউ কেউ।

সোনালী ॥ যুবতী। সপ্রতিভ, বলিষ্ঠ ও সাহসী। বৃত্তিতে পণ্যা; কিন্তু মন জীবনমুখী।

আমার দাদা ও দিদি

অধ্যাপক শ্যামকুমার বাগচী

ও

শ্রীমতী জয়ন্তী বাগচী—

সিঁ ড়ি/চ

লেখকের অন্যান্য বই—

অহল্যার রাত্রি—উপন্যাস

নাবিক—

সম্রাট— নাটক

অমৃতস্য পুত্রাঃ—"

ফেরা— "

সমুদ্রশংখ— "

প্রতিবাদ— "

সমুদ্র সন্ধানে/পাপ-পুণ্য

(একাঙ্ক নাটক)

সিঁড়ি/ছ

সিঁড়ি

[অন্ধকার মঞ্চে বাজনার শব্দ ভেসে এলো। একদল মানুষ বিউগিল-ড্রাম বাজিয়ে তালে তালে পা মিলিয়ে যেন, মিছিল করে চলেছে।

মিছিল অনেক দূরে চলে গেল। সামান্য নীরবতা। অন্ধকার মঞ্চে শব্দ হোল। একজন মানুষ প্রাণপণ শক্তিতে কিছু একটা ঠেলছে। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠানামার শব্দও ভেসে আসছে যেন।

লোকটা শব্দ করে জল খেলো। দূরে বেজে উঠলো কারখানার ভোরের বাঁশী। কিছু সময় স্থায়ী বাঁশীর শব্দের সঙ্গেই একফালি আলো এসে পড়লো মঞ্চে। দেখা গেল একজন বৃদ্ধ দর্শকের দিকে পেছন ফিরে মঞ্চের শেষ কোণে একটা বড় আকারের কাঠের গুঁড়ি ঠেলছে। লোকটার বয়স আন্দাজ করা অসম্ভব। এককালে যে সে প্রচণ্ড শক্তিমান ছিল সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। লোকটার গায়ে জামা ছিল না। খালি গায়ের মাংসল অভিব্যক্তি এখনো মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রুক্ষ চুল। তাকে দেখলে প্রথম নজরেই হিংস্র বলে মনে হবে। কিছু সময় চেয়ে থাকার পর মনে হবে তার মধ্যে রয়েছে শিশুর সারল্য আর অসহায়তা।

লোকটা আবার বারকয়েক গুঁড়িটা ঠেলে সরিয়ে রাখতে নিষ্ফল চেষ্টা করলো। সর্বাঙ্গ বেয়ে ঘাম ঝরছে। বুক ওঠা-নামা করছে জোরে জোরে। হঠাৎ লোকটা যেন গুমরে কেঁদে উঠলো।]

লোকটা ॥ পারলাম না……। আমার শক্তি নেই·· ·

(বারকয়েক দম নিলো)……কিন্তু কেন ? ·····কেন পারছি না ? (হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো। শব্দটা ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হোল কিছু সময়)। ··কি বললি ? ···বৃদ্ধ ? ··আমি বুড়ো হয়ে গেছি ? ···আমার পাঁজর ভেঙে গেছে ? ···(হঠাৎ হেসে উঠলো জোরে) ··তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো ? ····করো···যা খুশি তোমার···না না না। আমি কাউকে ডাকবো না·· একা···আমি একাই পারবো…।

[লোকটা আবার গুঁড়িটায় প্রথমে হাত পরে কাঁধ, তারপর মাথা দিয়ে ঠেলতে থাকলো পা পিছলে যায় ; সোজা হয়ে দাঁড়ায় আবার। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও অচল গুঁড়িটাকে সচল করে ওর পছন্দ মাফিক জায়গায় আনতে পারলো না। এবার সে বসে পড়লো।]

লোকটা ॥ অবাধ্য···। সমস্ত জীবনটাকে জ্বালিয়ে—পুড়িয়ে শেষ করে দিয়ে গেল। ···শত্তুর···চির-শত্তুর। (লোকটা রাগে ফুঁসতে থাকে)। দানাপানি দাও। বুকের রক্তমজ্জা দাও। একটু একটু করে… (কথা বন্ধ হয়ে গেল যেন) ···আমি কি করবো ? ··ও মরুক···মরুক। ···আমি কিচ্ছু জানি না। কিচ্ছু না···।

[লোকটা গিয়ে দাঁড়ালো জানালার কাছে। এবার দৃশ্যমান হোল সমস্ত মঞ্চ। বড় রাস্তার পাশে একখানা একচালা খুপ্‌রি। আস্তাবলের চাইতেও নিকৃষ্ট। এরই মধ্যে ওর আস্তানা। একপাশে ভেতরের দিকে পর্দা-ঘেরা জায়গা। যেখানে সেই গাছের গুঁড়ি। অন্যদিকে ছোট খাটিয়া। জলের কুঁজো। হাতুড়ি, বাটাল, কুড়ুল, কাটারি। রাস্তার দিকে ভাঙা টিনের দরজা। দরজার কাছে জানালা। চটের ছেঁড়া পর্দা ঝুলছে। ঘরখানা ময়লায় ভর্তি। অগোছাল। এদিকে-ওদিকে—কাঠের কয়েকটা মূর্তি পড়ে আছে।

নারীকণ্ঠের কান্নার স্বর ভেসে এলো যেন। লোকটা বিচলিত হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়।]

লোকটা॥ আবার? —আবার তুই কান্না সুরু করেছিস? তোকে না বার বার নিষেধ করেছি এমন করে কাঁদবি না? —তবু শুনবি না? কেন···? কেন এমন করে আমার পেছনে লেগেছিস? কেন? কেন?

[লোকটা বারকয়েক দম নিলো]

—না। আমাকে কিছুতেই রেহাই দেবে না। শত্তুর—শত্তুর ..।

[লোকটা হাতুড়ি বাটাল দিয়ে গুঁড়িটায় আঘাত সুরু করলো।]

—মানুষ করেছি ! শয়তান—শয়তান ! শয়তানকে বুকে-পিঠে করে…

[লোকটা বাটালের ওপর সজোরে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতে থাকলো। তালে তালে শব্দ উঠতে থাকলো।]

[খুপ্‌রির ওপর থেকে একটা পুরুষকণ্ঠ ভেসে এলো।]

নেপথ্য কণ্ঠ ॥ আবার শব্দ করছো? ··তোমাকে না বার বার বলেছি এ-সময়ে শব্দ করবে না? —আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয়?

[লোকটা ভয়ে যেন জড়োসড়ো হয়ে হাতের কাজ বন্ধ করে নির্বাক হয়ে গেল।]

—ফের যদি শব্দ করতে শুনি, তাহলে বলে দিচ্ছি, ও-ঘর থেকে বের করে দেবো, —মনে থাকে যেন।

[লোকটা নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে রইল কিছু সময়। তারপর হাতুড়ি বাটাল সরিয়ে একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে গুঁড়িটা চেঁছে পরিষ্কার করতে থাকলো।]

লোকটা ॥ ঘুমের ব্যাঘাত হয়…। উঃ! আমার মনিব! …হুকুম দিলেন? (হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল)—না। না, আমি মানি না। …আমি …আমি মানবো না—মানবো না তোমার হুকুম ··!

[হঠাৎ গুঁড়িটাকে লক্ষ্য করে ক্ষেপে উঠলো যেন।]

—কিন্তু তুই! তুই আমার কথা শুনছিস না কেন?

[দরজা ঠেলে একটা পুলিশের প্রবেশ। বোকা বোকা চেহারা। ডিউটি শেষ করে ফিরছে।]

পুলিশ ॥ এই বুড্ডা! —কি বাত বানাচ্ছিস? হে হে হে … …

[লোকটা ওকে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠে গেল গুঁড়িটার কাছে। ভ্রুক্ষেপহীন। কাজ আরম্ভ করলো আবার।]

পুলিশ ॥ ক্যা রে বুড্ডা। বাত বলছিস না যে? (একটু থেমে) হে হে হে হে। তুই বুড্ডা পাগল বনে গেছিস। সারাদিন এই আঁধারি ঘরে থেকে থেকে তোর মগজ একদম পচা আণ্ডা হয়ে গেছে।

[পুলিশটি নিঃসংকোচে কোণের খাটিয়ার ওপর গিয়ে বসলো। খৈনি টিপতে সুরু করে দিলো।]

পুলিশ ॥ আরে বাবা! সাধু ভি কভি কভি বাহার মে যায়। তু তো সাধুকা বাপ বনিয়ে গেলি। হা হা হা হা… ! লে, একটা বিড়ি ছোড়। শালা এমন ডিবটি পড়েছে একটু আরাম সে নিঁদ্ যাবার সুবিস্তা নেই। …কই বিড়ি ছোড়।

[লোকটা নিঃশব্দে একটা বিড়ি ছুঁড়ে দিল। পুলিশটি লুফে নিল সেটা।]

—এই বুড্ডা—

লোকটা ॥ কি বলছো?

পুলিশ ॥ আমার কথা ইয়াদ রেখেছিস?

লোকটা ॥ কোন্ কথা ?

পুলিশ ॥ আরে বুড্ডা ! তুই সাচ্‌মুছ্‌ বুড্ডা বনিয়ে গেছিস। —এতো কবে বললুম—তোব মনে নেই ?

লোকটা ॥ না।

পুলিশ ॥ শালা তোকে দিয়ে কুছু কাম হোবে না। (বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো)—আবে ব্যেওসা। —সেই ব্যেওসা

[লোভী দৃষ্টি ফুটে বেরুল চোখ দিযে।]

লোকটা ॥ আমি পারবো না। আমাব দ্বাবা ওসব কাজ হবে না।

পুলিশ ॥ হারে শালা—তুই দিনকে দিন বুববাক্ বনিযে যাচ্ছিস।— ভোয় কিসের ? হামি লিয়ে আসবো। তুই এখানে স্টক কববি। তারপর—হামি লোক পাঠাবো। তুই সাথ সাথ ঝেঁড়ে দিবি। —লেকিন হাঁ—মুনাফার ভাগ হামি ঠিক কববে। (হেসে) ভোয় নেই—ভোয় নেই। সার্চ হোলে হামি সাথ সাথ খবর ভেজিযে দেবে। তোকে ধরতে পারবে না।

[লোকটা একটা কথাবও জবাব দিল না। উদাসীন হয়ে কাজ করতে থাকলো।]

পুলিশ ॥ এই বুড্ডা।...এ ব্যেওসায় বহুৎ মুনাফা। তোব আর এই আঁধারি ঘরে থাকতে হোবে না। বড় দোকান বানাবি। বহুৎ আলো পাবি। বহুৎ বাতাস পাবি। চাহে কি সুন্দরী লেড়কী ভি—

লোকটা ॥ থামো—(ধমক দিয়ে উঠলো সহসা)

[আচম্‌কা ধমকে ঘাবড়ে গিয়েই নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে উঠলো পুলিশটা।]

পুলিশ॥ হা হা হা হা...! তু শালা বহুৎ হুঁশিয়ার আদমী আছিস। এমন দেখাচ্ছিস যেন সুন্দরী লেড়কী বিষ আছে। (হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে) তোর জরুরৎ না থাকে তো হামার আছে। সমঝে—?

[একটা অশ্লীল শব্দ বিড় বিড় করে উচ্চারণ করলো সে।]

লোকটা॥ আমার এখন কাজ আছে।

পুলিশ॥ (রেগে) হামকো ভি আছে।...আমি ফালতু বক বক্ করি না।—কি করবি বল?

লোকটা॥ কিসের?

পুলিশ॥ ব্যেওসা—শালা সাধুর বাচ্চা।

লোকটা॥ ওসব ব্যবসা আমি—

[হঠাৎ বাইরের গোলমালে কথা শেষ করলো না।]

পুলিশ॥ থামলি কেন? বল—

লোকটা॥ বাইরে রাস্তায় কিসের একটা গোলমাল হচ্ছে!

পুলিশ॥ হারে ছোড় দে।—সব কুত্তার বাচ্চা। রাতদিন হল্লা চালাচ্ছে—চাউর দে, গেঁহু দে, নোকরি দে—যতো স......

[আবার অশ্লীল শব্দ বিড় বিড় করে উচ্চারণ করলো। লোকটা কিন্তু পুলিশের কথা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো।]

পুলিশ॥ কি—হামার কথা তোর কানে গেল না?

লোকটা॥ ভেবে দেখি—পরে বলবো।

পুলিশ॥ তু বসে বসে ভাবনা কর। হামি ফিন্ সাম্‌কো আসবো। (কয়েক পা গিয়ে) এই বুড্ডা। ইয়াদ রাখনা। বহুৎ রূপেয়া।

[লোভী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেহাতী গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলে গেল।]

লোকটা॥ উঃ! ব্যবসা করে টাকা কামাবে। টাকা দিয়ে বড দোকান বানাবে। আলো আনবে। সুন্দরী—(থেমে গেল হঠাৎ)—বর্বর কোথাকার। আলো দোকান সুন্দরী চাই। মরবি। বিষের জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে মরবি। থুঃ!

[লোকটা বক্ বক করতে করতে নিজের কাজ সুরু করে দিল। চারিদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি এলো যেন। আরো অন্ধকার নেমে এলো ঘরখানায়। ওরই মধ্যে রাস্তায় কয়েকটা বোমা ফাটার শব্দ হোল। একটি যুবক দৌড়ে ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো। সে তখন হাঁফাচ্ছে। রুক্ষ চুল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বাইরের শব্দে নিজেকে লেপটে দিল দরজার সঙ্গে।—কোলাহল ক্রমশঃ দূরে চলে গেল।]

লোকটা॥ কে?—কে ওখানে?

[যুবকটি ভয় পেলো। ভয় পেয়ে সহজ হতে চেষ্টা করলো আবার।]

—কে ওখানে? কথা বলছো না যে?—কে?

যুবক॥ আমি—।

লোকটা॥ আমি?—আমি কে?

যুবক ॥ আমি—আমি রঞ্জন।

[রঞ্জন নিজেকে আরো স্বাভাবিক করতে খাটিয়ার ওপর বসলো। লোকটা একটা লণ্ঠন জেলে এগিয়ে এলো। ভালো করে লক্ষ্য করতেই অতি পরিচিতের মতো হাসলো রঞ্জন।]

লোকটা ॥ চিনলুম না।

রঞ্জন ॥ ভালো করে দেখো।

লোকটা ॥ না। চিনলুম না।

রঞ্জন ॥ আশ্চর্য।

লোকটা ॥ কি চাই তোমার ?

রঞ্জন ॥ অনেক কিছু।

লোকটা ॥ তার মানে ?

রঞ্জন ॥ ঘর টাকা সুখ। মানুষে যা চায়।

লোকটা ॥ এখানে কেন ?

রঞ্জন ॥ তোমার কাছে।

লোকটা ॥ আমার কাছে এসে লাভ নেই। ওসব আমার কাছে নেই।

রঞ্জন ॥ তাহলে ?

লোকটা ॥ চলে যাও এখান থেকে।

রঞ্জন ॥ তুমি ?

লোকটা ॥ (অবাক হয়ে) আমি ! আমি কি ?

রঞ্জন ॥ তুমি যাবে না ?

লোকটা ॥ কোথায় ?

রঞ্জন ॥ আমার সঙ্গে।

[লোকটা বিস্ময়ে চেয়ে রইলো কিছু সময়।]

লোকটা ॥ তোমার আর কোন কাজ আছে ?

রঞ্জন ॥ আছে। কিন্তু করতে পারছি না। শরীরটা খারাপ লাগছে। কাল সারারাত পথ হেঁটেছি। হাঁটতে হাঁটতে একসময় ছুটেছি—।

লোকটা ॥ ছুটতে ছুটতে এখানে এলে কেন ?

রঞ্জন ॥ তোমার কাছে থাকবো বলে।—সত্যি বলছি তোমার কাছে থাকবো।

[রঞ্জন একটা সিগারেট বের করলো।]

লোকটা। অসম্ভব।—এখন আমার বাজে কথা বলার সময় নেই। তুমি যেতে পারো।

রঞ্জন ॥ দারুণ মেঘ করেছে। জোর বৃষ্টি আসবে মনে হয়।

লোকটা ॥ আমি কি করবো ?

রঞ্জন ॥ না, বলছি তোমার এখানে আবার ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ে না তো ? যা ঘরের অবস্থা। ঘর তো নয়—যেন গোয়াল-ঘর। এখানে থাকো কি করে ? ঘেন্না করে না ?

লোকটা ॥ (রেগে) তোমার কাছে আমি কি তার কৈফিয়ৎ দেবো ?

রঞ্জন ॥ (হো হো শব্দে হেসে) কি আশ্চর্য ! তোমাকে দেখলে তো মনে হয় না যে, তুমি রাগ করতে পারো !

লোকটা ॥ ~~আমার সঙ্গে তুমি রসিকতা করতে এসেছো~~ ?—দোহাই তোমার ! আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।

[রঞ্জন সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়ালো। সে যেন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ।]

রঞ্জন ॥ যাক ; যা ভেবেছিলাম— ঠিক তাই। আমার ভুল হয়নি।

লোকটা ॥ (বিস্ময়ে) কার কথা বলছো তুমি ?

রঞ্জন ॥ তোমার কথা। এখানে তুমি আর আমি ছাড়া তৃতীয়জন তো কেউ নেই !

লোকটা ॥ কি ভেবেছিলে ?

রঞ্জন ॥ তুমি বড় একলা। নিঃসঙ্গ। ঠিক আমার মতো।

লোকটা ॥ (কেঁপে উঠলো) না। আমি একলা নই।

রঞ্জন ॥ মিথ্যে কথা।

লোকটা ॥ আমি নিঃসঙ্গ নই।

রঞ্জন ॥ সম্পূর্ণ অসত্য।

লোকটা ॥ (ধমক দিয়ে) চুপ করো। তোমার কোনও কথা সত্যি নয়। তুমি—

রঞ্জন ॥ (হেসে) ভয় পাচ্ছো ?—ভয় নেই। আমি কাউকে বলবো না। এখন দয়া করে আর বক্ বক্ না করিয়ে একটু হাত-পা ছড়িয়ে শুতে দাও দিকি। বড় ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। পুরো দুটো দিন পরে আজ একটু ঘুমোবো।

[রঞ্জন সম্মতির অপেক্ষা না করেই খাটিয়ার ওপর বসলো। যেন এটা তার নিজের সম্পত্তি।]

রঞ্জন ॥ ধ্যেৎ ! এর ওপর শোও কেমন করে ?

লোকটা ॥ (অসহায়ভাবে)—কি আশ্চর্য ! আমি চাই না তবু আমার ঘরের মধ্যে এসে ঝামেলা করবে !—অনুগ্রহ করে অন্য কোথাও যাও।

রঞ্জন ॥ অন্য কোথাও তোমার মতো বন্ধু পাবো না।

[রঞ্জন খাটিয়ায় শুয়ে পড়লো ।

লোকটা ॥ আমি তোমার বন্ধুত্ব স্বীকার করবো না।

রঞ্জন ॥ ওটা ঢাক্-ঢোল পিটিয়ে স্বীকার করার দরকার হয় না। এমনিতেই হয়ে যায়।

লোকটা ॥ তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করছো?

রঞ্জন ॥ ধেৎ। তুমি কিচ্ছু বোঝ না। রসিকতা আমি করবো কেন? রসিকতা করছেন বিধাতা। তোমার সঙ্গেও করছেন। আমার সঙ্গেও করছেন। আসলে আমরা দুজনেই হচ্ছি—বিধাতার রঙ্গমঞ্চে দুটি বুদ্ধিমান ভাঁড়।

[লোকটা বিপন্ন হয়ে কি যেন বলতে গেল।]

রঞ্জন ॥ আঃ! আর বক্ বক্ না করে নিজের কাজ করো। আমার ঘুম পাচ্ছে। (হাই তুলে) আর শোন। শব্দ করলেও আমার কিছু এসে যাবে না। শব্দের মধ্যেও আমি দিব্যি নাক ডেকে ঘুমোতে পারি।

[হঠাৎ বাইরে কয়েকজনের কণ্ঠস্বরে রঞ্জন সচকিত হয়ে উঠে বসলো।]

নেপথ্যে-প্রথম ॥ না—না। আমি নিজে দেখেছি।

„ দ্বিতীয় ॥ আমিও দেখেছি। সে ছুটে পালিয়েছে।

„ তৃতীয় ॥ ধরতে পারলি না? কোথায় পালালো?

„ প্রথম ॥ ধরবো কেমন করে? হাতে বোমা ছিল।

„ দ্বিতীয় ॥ আমি লক্ষ্যকে একখানা ছুরি দেখেছি।

„ তৃতীয় ॥ ধরতেই হবে। যেভাবেই হোক।

নেপথ্যে-প্রথম ॥ তাহলে চল চল, ছুটে চল।

,, দ্বিতীয় ॥ কোনদিকে ছুটবো ?

,, তৃতীয় ॥ এই দিকে—

[কোলাহল দরজা অবধি এগিয়ে এলো। রঞ্জনের চোখ জোড়া হিংস্র হয়ে জলছে। লোকটা দরজামুখো পা বাড়াতেই মুহূর্তে রঞ্জন লোকটাকে ঝাপটে ধরলো।]

রঞ্জন ॥ খবরদার !……আমি তোমার বন্ধু !

[লোকটা জোর করলো না। নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল। কোলাহল দূরে চলে যেতেই রঞ্জন ছেড়ে দিল তাকে।]

লোকটা ॥ ব'সো।…(রঞ্জন বসলো না) জেনে পাপ করেছো—না—না জেনে? কি দাঁড়িয়ে রইলে যে? শুতে ইচ্ছে করছে না?

রঞ্জন ॥ না।—(কণ্ঠস্বর নিরাসক্ত)

লোকটা ॥ কেন? আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি। গায়ে তোমার মতো জোর নেই। আর কোলাহলও দূরে চলে গেছে।

রঞ্জন ॥ তোমার কাছে ধরা পড়ে গেলাম। আর বসে থেকে লাভ নেই।

লোকটা ॥ ধরা না পড়লে?

রঞ্জন ॥ নিজেকে মহৎ বানাতুম। লম্বা একটা ঘুম দিতুম। তারপর জেগে উঠে বাণী তৈরি করতুম।

লোকটা ॥ ইচ্ছে করলে তো কোলাহলকে এখন অস্বীকার করতে পারো।

রঞ্জন ॥ ইচ্ছে করছে না।

লোকটা ॥ কেন ?

রঞ্জন ॥ না,—মিথ্যে চেষ্টায় লাভ নেই।

লোকটা ॥ (বিদ্রূপে) কেন—বৈরাগ্য ?

[কথা শেষ করে অদ্ভুতভাবে হাসলো লোকটা।

রঞ্জন ॥ অমন করে হেসো না। হয় ঘৃণা করে অভিশাপ দাও। নইলে—

লোকটা ॥ নইলে আদর করে আশীর্বাদ করবে'—তাই না ? অপদার্থ। —ব'সো। পেটে কিছু আছে ?

রঞ্জন ॥ কি বললে ?

লোকটা ॥ হাঁ করে ভাবছো কি ? বলছি যে পেটে কিছু আছে ? না—খিদে পায়নি ?

রঞ্জন ॥ আমি এখন চলি।

লোকটা ॥ কোথায় যাবে ?

রঞ্জন ॥ ঠিক নেই। একটা কোন নিরাপদ জায়গায়। যেখানে গিয়ে নিশ্চিন্তে কিছু সময় ঘুমোনো যাবে।

লোকটা ॥ আবার ঘুম ভাঙলে ? তখন কোথায় যাবে ?—ছায়া তো সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

রঞ্জন ॥ (হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে) চুপ ! আমাকে জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে। আমি পাপ করি আর পালিয়ে বেড়াই, তাতে কারু কিছু বলার নেই।—আমি যাবো।

লোকটা ॥ না। তুমি এখন যেতে পারবে না।

রঞ্জন ॥ না ? তুমি আমার গার্জেন নাকি ?

[রঞ্জন দরজার কাছে যেতে দ্রুত দরজা আটকে দাঁড়ালো লোকটা।]

লোকটা ॥ আমি যেতে দেবো না।

রঞ্জন ॥ (চিৎকার করে) দরজা ছেড়ে দাও বলছি। (মুখোমুখি দাঁড়িয়ে) ছেড়ে দাও। একটু আগে তো তাড়িয়ে দিচ্ছিলে। এখন কেন? পথ ছেড়ে দাও।

লোকটা ॥ তখন—কেন আমাকে জাপটে ধরেছিলি?

[হঠাৎ লোকটা রঞ্জনের মুখে সজোরে আঘাত করলো।]

—কেন? বল, বল, কেন ধরেছিলি?

[আকস্মিক চড়ের আঘাতে থতোমতো খেল রঞ্জন। সে যেন শিশু হয়ে গেছে। লোকটা দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাড়ালো।]

রঞ্জন ॥ আমার খিদে পেয়েছে।

[কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল থেকে লোকটা খাবার এনে দিল।]

রঞ্জন ॥ এই খাও নাকি? (রঞ্জন যেন ব্যঙ্গ করলো) তোমার পেট ভরে?

লোকটা ॥ বড়োলোকী চাল চলবে না। যা আছে তাই গিলে নাও চট্‌পট।

রঞ্জন ॥ তোমার সব খাবারটা দিয়ে দিলে?

লোকটা ॥ অতো মহত্ত্ব আমার নেই।

রঞ্জন ॥ কিন্তু তুমি কি খাবে? খাবার আর আছে?

লোকটা ॥ আচ্ছা! আমাকে বিরক্ত করবার অধিকার তুমি কোথায় পেলে? (একটু থেমে) চট্‌পট খেয়ে এখান থেকে পালাও। যা বললুম, শহরের দিকে যেও না।

[রঞ্জন খেতে বসলো। এমনভাবে খেতে লাগলো যেন অনেকদিন পরে সে খেতে পেলো। নেপথ্যে পুলিশটি কথা বলে উঠলো।]

পুলিশ॥ এই বুড্ডা। —কি করছিস?

[রঞ্জন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।]

লোকটা॥ (ভীতস্বরে) পুলিশ।

[রঞ্জন অর্ধভুক্ত খাবার ফেলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ছুরি বের করলো। ছুরিতে হাত চেপে ধরলো লোকটা।]

লোকটা॥ না।

রঞ্জন॥ হাত ছেড়ে দাও। আমি পালাবো।

লোকটা॥ না।

রঞ্জন॥ (গর্জে উঠলো) ছেড়ে দাও বলছি।

লোকটা॥ কিছুতেই না।

নেপথ্যে পুলিশ॥ এই বুড্ডা। কথার জবাব দিচ্ছিস না যে?

রঞ্জন॥ ছেড়ে দে—

[হ্যাঁচকা টানে হাত ছাড়িয়ে নিতেই লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়লো দরজার ওপরে। দরজা আটকে দাঁড়ালো।]

লোকটা॥ না। বাইরে বেরিয়ে তুই ছুরি মারবি। তোকে বের হতে দেবো না। (আবার হাত ধরলো রঞ্জনের)

রঞ্জন॥ আমাকে তুই ধরিয়ে দেবার মতলব আঁটছিস? হাত ছেড়ে দে বলছি—

লোকটা ॥ না।

[এবার লোকটা যেন গর্জে উঠলো। রঞ্জনকে আর কথা বলার অবকাশ দিল না। টানতে টানতে রঞ্জনকে নিয়ে গেল কোণের দিকে পর্দা ঘেরা জায়গায়। নিজে দ্রুত এসে বসলো রঞ্জনের জায়গায়। দু' এক গ্রাস খাবার মুখে দিল। পুলিশের প্রবেশ। হাতে একটা পুঁটলি। সেও যেন কিঞ্চিৎ ভীত। ঘরে ঢুকে দরজাটা ভাল করে ভেজিয়ে দিল।]

পুলিশ ॥ এই বুড্ডা! বোবা বনিয়ে……ও, তু খানা খাচ্ছিস। তাই সাড়া দিচ্ছিস না।

লোকটা ॥ আবার কেন এসেছো?

পুলিশ ॥ তু খানা শেষ কর। তারপর কথা হবে।

[পুলিশটি খাটিয়ার ওপর বসতেই খাবার ফেলে উঠে দাঁড়ালো লোকটা।]

লোকটা ॥ আমার খাবার শেষ করতে অনেক দেরি হবে। তুমি বলো।

পুলিশ ॥ উস্ মে কেয়া হ্যায়। হামি ততোক্ষণ একটু ঘুমিয়ে লিবে। —লে খা। সুরু কর।

লোকটা ॥ দোহাই তোমার। আমি হাত জোড় করছি। তোমার যা বলার আছে—বলো। আমার অনেক কাজ আছে।

পুলিশ ॥ তোর কাম আছে? (হঠাৎ হো হো শব্দে হেসে উঠলো) —দিনরাত এই আঁধারি ঘরে তুই কি কাম করিস রে?

লোকটা ॥ (বিরক্ত হয়ে) দর্শন পড়ি। বুঝতে পেরেছো ?

পুলিশ ॥ কেয়া !—(বোকার মতো তাকালো)

লোকটা। যাকগে। তুমি আবার কেন এসেছো ? —তাড়াতাড়ি বলো।

[পুলিশ আর কথা না বাড়িয়ে পুঁটলিটা দেখালো।]

পুলিশ ॥ লিয়ে এসেছি। —খুব সাবধান। লে ধর।

লোকটা ॥ —কি ওটা ?

পুলিশ ॥ সেই মাল। —বহুৎ রূপেয়া হবে। - চাহে কি—

লোকটা ॥ তোমাকে তো বার বার বলেছি ওসব জিনিস আমি রাখতে পারবো না। তুমি অন্য কোথাও রাখো। আমার কাছে নয়।

পুলিশ ॥ আমার সাথে তুই দিল্লাগী করছিস ?

লোকটা ॥ তোমার যা ইচ্ছে তাই ভাবতে পারো। —এখন আমাকে একটু স্বস্তি দাও—।

[পুলিশটি অপমানিত বোধ করে উত্তেজিত হয়ে পড়লো।]

পুলিশ ॥ আরে লে লে সাধুর বাচ্চা। থাম থাম। ধম্ম বাত বানাচ্ছে। 'ব্যেওসা করবো না।' ঠিক আছে। —ম্যায় ভি ফালতু আদমী নেহি। —হামি যাচ্ছে। লেকিন ইয়াদ রাখনা—

[কথা শেষ হবার আগেই তিনজন লোকের প্রবেশ। তারা যেন উর্ধশ্বাসে ছুটে এলো। ওদের চেহারার মধ্যে অমানবিক বর্বরতার ছাপ। হুড়মুড় করে ঢুকেই লোকটার মুখোমুখি হোল ওরা।]

প্রথম ॥ এখানে এসেছে ? দেখতো খুঁজে।

দ্বিতীয় ॥ হাঁ করে কি দেখছো? তাড়াতাড়ি বলো।

তৃতীয় ॥ তোমার ঘরে ঢুকেছে নাকি?

লোকটা ॥ তোমরা কার কথা বলছো?

প্রথম ॥ একটা লোক। ভয়ংকর দেখতে।

দ্বিতীয় ॥ নামকরা জুয়াড়ী। ভীষণ চেহারা।

তৃতীয় ॥ প্রচণ্ড বদ্‌মাস। সাংঘাতিক হাবভাব।

লোকটা ॥ কই—না তো। এমন লোককেতো দেখিনি।

প্রথম ॥ সে কি। আমি দেখলাম বড রাস্তা ধরে ছুটতে ছুটতে এই দিকে ঢুকে পড়লো।

দ্বিতীয় ॥ দু'হাতে চারটে বোমা ফাটিয়ে ঐ বড বাড়িটা পার হোল।

তৃতীয় ॥ একটা পুলিশকে ছুরি মেরে দেওয়াল টপ্‌কে এদিকে এলো।

লোকটা ॥ কই না তো! আমি—

প্রথম ॥ তুমি হয়তো দেখনি। সে এদিকেই ঢুকেছে।

দ্বিতীয় ॥ দেখবে কি করে? এ তো একটা হাডকাঠ বুড়ো।

তৃতীয় ॥ তার ওপর ভালো করে চোখেও দেখতে পায় না। —দিন কানা।

[ওরা তিনজনে হা হা শব্দে হেসে উঠলো। পুলিশটা নির্বাক।]

প্রথম ॥ আরে, এই তো দেখছি একজন পুলিশ। —কি ব্যাপার?

দ্বিতীয় ॥ তাই তো; তুমি কি করছো? খুঁজে পেয়েছো?

তৃতীয় ॥ ওর পেছন পেছন ছুটে এসেছো বুঝি?

[তিনজনের দ্রুত উচ্চারিত শব্দে পুলিশটা বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল।]

প্রথম ॥ আরে—তুমিও দেখছি বোবা হয়ে গেছো?

দ্বিতীয় ॥ তাড়াতাড়ি চলো। ওকে আজ ধরতেই হবে।

তৃতীয় ॥ তাড়াতাড়ি বলো তো। গলির মধ্যে এসে কোনদিকে গেল ?

[পুলিশটি হঠাৎ উপায় খুঁজে নিতে রাস্তার দিকে ঝুঁকলো।]

পুলিশ ॥ ঐ—ঐ দিকে।

সকলে ॥ চলো চলো চলো—।

প্রথম ॥ (পুলিশের হাত ধরে) শীগগীর এসো। আ! দাঁড়িয়ে কেন ?

[ওরা একসঙ্গে পুলিশকে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ মনে হোল ঘরখানার ওপর একটা ঝড় বয়ে গেছে। তারপর চারিদিকে নিঃসাড় শব্দহীন। লোকটা নির্বাক। জানালা দিয়ে রাস্তার কোলাহল দেখলো। ধীরে ধীরে পর্দা সরিয়ে এলো রঞ্জন। উভয়ে কিছুসময় পরস্পরের দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।]

রঞ্জন ॥ হেরে গেলাম…! রাজাসাজা আর হোল না। (কিছুসময় নীরবতা) তোমার চোখে এখন তো আমি শূন্য—তাই না ? …ভেবেছিলাম নিজেকে এবার আমি মহৎ বানাবো। পারলাম না! এমন কপাল যে, তোমার ভাঙা ঘরেও আমার রূপকথার মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা গেল না। কী আশ্চর্য!

[অদ্ভুত বিষণ্ণ ভঙ্গিমায় হাসলো। লোকটা গিয়ে তার কাজে বসলো।]

রঞ্জন ॥ যাক গে! দুঃখ পাচ্ছিনে। রূপকথা—সে তো রূপকথাই। …এই মুহূর্তে আমার কি মনে হচ্ছে জানো ? —ওরা এসে

ভালোই করেছে। নইলে মিথ্যে জীবন তোমার সামনে দাঁড় করাতে আমার কি প্রাণান্তই না হোতো? …এ একরকম মুক্তি ঘটে গেল! কি বলো?

[রঞ্জন জবাবের প্রত্যাশা করলো। কিন্তু লোকটা নির্বাক। নিজের কাজে যেন মগ্ন।

রঞ্জন॥ তোমাকে ধন্যবাদ যে তুমি ওদের হাতে আমাকে ধরিয়ে দাওনি। —বছর পাঁচেকের জেল থেকে বেঁচে গেলাম। তবে যেখানে লুকিয়েছিলাম—সেখানে কতকগুলো আরশোলা বড্ড বিরক্ত করেছে। ওগুলো তাড়িয়ে দিও।

[লোকটা তবু নির্বাক, আবেগহীন।]

রঞ্জন॥ না। তুমি কাজ করো। তোমাকে আর বিরক্ত করবো না। চলি—(প্রস্থানোদ্যত)

লোকটা॥ খাওয়াটা শেষ করে যাও।

রঞ্জন॥ (থমকে দাঁড়ালো) আমাকে বলছো?

লোকটা॥ এখানে তুমি আর আমি ছাড়া তৃতীয়জন তো কেউ নেই।

রঞ্জন॥ তোমার ভয় করছে না?

[লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। সে চাউনির অর্থ বুঝলো না রঞ্জন।]

রঞ্জন॥ তোমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে না? ইচ্ছে হচ্ছে না—ঘাড় ধরে ঘর থেকে বের করে দিতে?

লোকটা॥ আমার আরও অনেক কাজ আছে। খাওয়াটা তাড়াতাড়ি শেষ করলে বাধিত হবো।

রঞ্জন ॥ শুনলে না আমি খুনে? আমি বদমাস! আমি একটা সাংঘাতিক ধরনের জীব?

লোকটা ॥ শুনেছি।

রঞ্জন ॥ শুনলে না আমি বোমা ফাটাই; ছুরি মারি, লোকের সর্বনাশ করি।

লোকটা ॥ হ্যাঁ, তাও শুনেছি।

রঞ্জন ॥ তবু তুমি আমাকে খেতে বলছো?

লোকটা ॥ (রেগে) আমি কি তোমার হুকুমের দাস? যে আমি তোমাকে কৈফিয়ৎ দেবো? তোমার হুকুম মেনে চলবো?—তুমি কি পেয়েছো আমাকে?

রঞ্জন ॥ আমার ওপর রেগে গেলে?

লোকটা ॥ খাবার পড়ে আছে। খেয়ে গেলে কৃতার্থ হবো।

[লোকটি আর কথা না বলে কাজে মন দিল। সে তখন খোদাইয়ের কাজে তন্ময়। রঞ্জন আর প্রতিবাদ করলো না। খেতে বসলো আবার।]

রঞ্জন ॥ তা মন্দ বলোনি। খাওয়াটা শেষ করে নিই। পথে আবার কখন কোথায় খেতে বসবো—তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তোমার মতো কেউ খেতে দেবে না, একথা সত্যি! (একটু হেসে) জানো, একবার এক ভদ্রলোক আমাকে নিমন্ত্রণ করে খেতে বসিয়েছিলেন। অনেক রকমের পদ। ভদ্রলোক শংকর দর্শন নিয়ে রিসার্চ করছেন। আমার কথায় নাকি শংকরের মায়াবাদ সম্পর্কে নতুন এক সংজ্ঞা খুঁজে পেয়েছেন তিনি। আমিও খাবারের পরিমাণ দেখে দ্বিগুণ বকে যাচ্ছি। হঠাৎ তাঁর

মামাবাবু এসে কানে কানে তাঁকে কি যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক অন্য মানুষ। শংকরের মায়াবাদের প্রয়োগ ঘটালেন আমাকে অর্ধভুক্ত রেখে। হা হা হা হা—

লোকটা ॥ তুই শংকরের মায়াবাদ পড়েছিস নাকি?

রঞ্জন ॥ ওটা পড়তে হয় না। চোর-ডাকাত-খুনী' আসামীদের ওটা মজ্জাগত।—কে রান্না করেছে?

লোকটা ॥ কেন?

রঞ্জন ॥ চমৎকার স্বাদ হয়েছে। আর একটু দাও।

লোকটা ॥ (ব্যঙ্গ করে) স্বাদ-জ্ঞান তাহলে আছে তোমার?

রঞ্জন ॥ যত বড় বাউণ্ডুলে আর পাপী হই না কেন—ও জ্ঞানটা আমার কিন্তু টনটনে। রান্নায় নুন-ঝাল-টক-মিষ্টি ঠিক তারিয়ে হওয়া চাই। আমার মা এজন্য কম জ্বালাতন ভোগ করেন নি।

লোকটা ॥ মা কোথায়?

রঞ্জন ॥ মারা গেছেন।

লোকটা ॥ বেঁচে গেছেন।

রঞ্জন ॥ আমারও তাই মনে হয়। নইলে মা আজ আত্মহত্যা করতেন।

লোকটা ॥ যা এখন তুমি করছো—তাই না? অপদার্থ।

রঞ্জন ॥ উঁহু! জ্ঞান দিও না। ওসব কথা শুনলে আমার হাত নিসপিস করতে থাকে। বাবাকে তো একদিন মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল।

লোকটা ॥ বা! ভক্ত প্রহ্লাদ। বাবা কোথায়?

রঞ্জন ॥ তিনিও আমার প্রথম জেল খাটার সময় পরলোকে কেটে পড়েছেন।

লোকটা ॥ ইহলোকের কীর্তিমান ছেলেটার লজ্জায়।

রঞ্জন ॥ হ্যাঁ, মা তাই বলতেন। তবে সেবার জেলখাটার জন্য কিন্তু আমি দায়ী ছিলাম না। যে জেল খাটিয়েছিল—আসলে তারই দোষ ছিল বেশি। (একটু থেমে যেন দম নিলো) বীণা শেষ পর্যন্ত আমাকে প্রতারণা করেছিল। —আমি বুঝতেই পারিনি। বড্ড নির্বোধ ছিলাম কি না।

[লোকটা রঞ্জনের পাত শূন্য দেখে আরও খাবার দিল। রঞ্জন প্রতিবাদ করলো না। সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে।]

রঞ্জন ॥ বড্ড আশা ছিল আমার—। মাকে বলতাম এবার পথ খুঁজে পাবো।—ঘর তৈরিও সুরু করে দিয়েছিলাম—। মা মন্দিরে রোজ পুজো দিতেন—। কিন্তু শেষরক্ষা করা গেল না।—ঘরে ঢোকার আগেই আমাকে জেলে ঢুকতে হোল।

[ম্লান হাসিতে মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে গেল।]

জেলে যাবার আগে মার কান্না দেখে সেই প্রথম আর শেষবারের মতো আমি কেঁদেছি।…এরপর কতোবার যে কাঁদতে ইচ্ছে হয়েছে! কিন্তু পারিনি।

লোকটা ॥ কেন?

রঞ্জন ॥ কাঁদতে গেলে মার কান্না আর বীণার হাসি একসঙ্গে মনে পড়েছে। কান্না ফুরিয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গেই।

[রাস্তা দিয়ে সানাই বাজিয়ে একদল বিয়ের বরযাত্রী চলে গেল। ওরা দুজন তন্ময়। রঞ্জন এসে দাঁড়ালো জানালায়। সে যেন অন্য জগতের মানুষ।]

রঞ্জন ॥ কতো আনন্দ! (অস্ফুটে উচ্চারণ করলো)

লোকটা ॥ কি বললি ?

রঞ্জন ॥ না। কিছু না। (সামলে নিলো নিজেকে) কিছু সময় ভালো কাটলো। তোমাকে বিরক্ত করে গেলাম খানিকটা। চলি—

লোকটা জবাব দিল না। রঞ্জন 'হ্যাঁ' 'না' জবাবের প্রত্যাশায় কিছুক্ষণ নিষ্ফল দাঁড়িয়ে থেকে প্রস্থানোদ্যত হতেই দরজায় ধাক্কা খেল—এইসব বাড়ি-ঘর-জমি জায়গার মালিক হরনাথবাবুর সঙ্গে। রুক্ষ প্রকৃতির মানুষ তিনি।]

হরনাথ ॥ (খেঁকিয়ে উঠলেন) আ। চোখের মাথা কি একেবারেই খেয়েছো নাকি ! যতো সব। (একটু এগিয়ে) এই বুড়ো ! ঘর ছাড়ছো কবে ?

লোকটা ॥ বসুন আপনি—

হরনাথ ॥ তোমার এখানে বসবার জন্য আমি আসিনি। কবে এখান থেকে উঠছো তাই জানতে এসেছি।

লোকটা ॥ আমার যে উঠে যাবার মতো কোন জায়গা নেই।

হরনাথ ॥ সেটা আমার ভাববার কথা নয়। তুমি কবে উঠছো তাই বলো।

লোকটা ॥ এখানে আমি থাকলে আপনার তো কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। আমি—

হরনাথ ॥ অসুবিধে হচ্ছে কি হচ্ছে না সে কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দেবো না। আমার শুধু একটি কথা—ঘর তোমাকে ছাড়তেই হবে।

লোকটা ॥ এটা কি মানুষের বাস করার মতো ঘর ?

হর ॥ তাহলে তুমি থাকছো কেন ?

লোকটা ॥ উপায় নেই বলে। আর তাছাড়া এ-ঘরে কোন মানুষ থাকবে না বলে।

হর ॥ মানুষ না থাক পশুরা থাকবে তো? আমিও তাই চাই। তোমাদের চেয়ে গরু মোষ অনেক ভালো। ইস্ ঘরখানার কি অবস্থা করে তুলেছো (কাঠের গুঁড়ি দেখিয়ে) এটা? বলি এটা কি?

[লোকটার মুখে বিরক্তি, কিন্তু জবাব দিল না।]

—এসব চলবে না। এটা মিস্ত্রীখানা নয়। দিন নেই, রাত নেই—খট্‌খট্ খট্‌খট্ চলছেই।

[লোকটা নিজের কাজে মন দিল।]

—কি আমার কথা কানে যাচ্ছে না?

লোকটা ॥ আমি কালা নই।

হর ॥ ও! আমাকে চোখ রাঙানো হচ্ছে। ঠিক আছে। তিনদিন ...মাত্র তিনদিন সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে যদি তোমার পোট্‌লা-পুট্‌লি না গোটাও—তাহলে সেগুলো পথ থেকে কুড়োতে হবে মনে থাকে যেন।

[প্রস্থানোদ্যত হতেই রঞ্জনের সঙ্গে চোখা-চোখি হলো।]

হর ॥ তুমি কে?

রঞ্জন ॥ একটু আগে যা বললেন তাই।

হর ॥ তার মানে?

রঞ্জন ॥ ঐ লোকটা চলে যাবার পর যারা এখানে থাকবে—সেই পশু। দেখুন তো, পছন্দ হয় কিনা ?

[রঞ্জনের গম্ভীর কণ্ঠস্বর আর বে-পরোয়া ভাব দেখে ঘাবড়ে গেলেন হরনাথ।]

হর ॥ এটা কি শুঁড়িখানা নাকি ! কোথাকার কতকগুলো বদমাস আর মাতাল এসে জুটেছে এখানে। পরিবেশটাকে একেবারে নষ্ট করে দিলো। দিন নেই, রাত নেই—

রঞ্জন ॥ এই যে মশাই ! চিৎকার করবেন না। যা বলার আস্তে বলুন। নইলে—

হর ॥ নইলে— ? নইলে কি ?

রঞ্জন ॥ নইলে পাঁড় মাতালের মাথা ঠিক থাকবে না। কিছু একটা করে বসতে পারে—এই আর কি ! সেটা এই ভদ্র পরিবেশে কি ভালো দেখাবে ?

[হরনাথ অবস্থার গুরুত্ব বুঝলেন। সামলে নিলেন নিজেকে।]

হর ॥ ঠিক আছে। তিনদিন সময় দিচ্ছি। তারপর দেখবো মাতালের মাথা ঠিক থাকে কিনা ? আমার নামও হরনাথ পুরকায়স্থ। অনেক পাঁড় মাতালের মাথা ঠিক করেছি আমি।

[দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন। ঘরখানায় নির্মম স্তব্ধতা নেমে এলো।]

রঞ্জন ॥ তারপর ?—কি ভাবছো ? তিনদিন ?

[লোকটা কি একটা জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল।]

রঞ্জন ॥ তিনদিন ! সময়টা কম মনে হলেও—নিতান্ত কম নয়।

মিনিট সেকেণ্ড মিলিয়ে সে অনেক। ইচ্ছে করলে এই গোটা-বাড়িটা উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

[লোকটা একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললো।]

রঞ্জন॥ বাড়ি উড়িয়ে দিলে পাপ নেই। কারণ তুমি-আমি রাস্তায় দাঁড়ানো লোক। বাড়ি উড়িয়ে দেবার পর এ-বাড়ির বাসিন্দারাও আমাদের মতো রাস্তায় দাঁড়াবে। আমাদেব চাইতে নীচেয় নামবে না। কি বলো?

লোকটা॥ আমি চলেই যাবো।

রঞ্জন॥ (বিস্ময়ে) চলে যাবে। কেন? ঐ আহাম্মুখটার ভয়ে?

লোকটা॥ না। থাকবার অধিকার নেই বলে।

রঞ্জন॥ (ক্ষেপে উঠলো) অধিকার। কিসের অধিকার? কে বিচার করবে তোমার—আমার অধিকার-অনধিকারের কথা? ঐ আহাম্মুখটা?

লোকটা॥ (ভয়ে) রঞ্জন।

রঞ্জন॥ শোন, তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না। এক পাও নড়তে পারবে না। ওদের মনোরম করে তৈরি করা শব্দটাকে দেওয়ালে ঠুকে ঠুকে আমাদের অধিকার প্রকাশ করবো। বুঝলে? অধিকার। শব্দটা যেন ওদেরই একচেটিয়া। ওরা উচ্চারণ করবে অধিকার। আমরা উচ্চারণ করবো অনধিকার।

[রঞ্জনকে ভয়ংকর বলে মনে হোল।]

লোকটা॥ তুই এখান থেকে চলে যা।

রঞ্জন॥ না। আমি যাবো না।

লোকটা॥ কেন? এখানে বুঝি ছুরি মারা আর বোমা ছোঁড়ার সুযোগ পাবি—তাই না?

রঞ্জন ॥ (আরও ক্ষেপে গেল) হ্যাঁ তাই। আমি ছুরি মারবো। বোমা ফাটাবো। আমি আগুন জ্বালাবো। আমি একটু একটু করে বিষ ছড়াবো। বাধা দেবার সাহস আছে?

[রঞ্জন হিংস্র দৃষ্টিতে তাকালো।]

লোকটা ॥ (অসহায়ভাবে) রঞ্জন!

রঞ্জন ॥ পাপ! হ্যাঁ, আমি পাপ করেছি। আমি পাপ করবো। তোমাদের পুণ্যের দুধে পাপের বিষ মিশিয়ে সকলকার বুকে পা চেপে আমি মুখের মধ্যে ঢেলে দেবো।

লোকটা ॥ রঞ্জন! (কেঁদে উঠে হাত চেপে ধরলো)

রঞ্জন ॥ ছেড়ে দাও (হাত টেনে নিতে নিষ্ফল চেষ্টা করলো)

লোকটা ॥ না।

রঞ্জন ॥ ছেড়ে দে! নইলে তোকে শেষ করবো।

লোকটা ॥ তাই কর। তাই কর। আমাকে শেষ করে দে রঞ্জন। আমাকে শেষ করে দেবার কেউ নেই। আমি বড়ো নিঃসঙ্গ রঞ্জন···! বড়ো একলা!

[রঞ্জনের হাত কপালে ঠুকতে থাকলো লোকটা। পাঁজর ভাঙা কান্নায় যেন ভেঙে পড়লো। রঞ্জন হাত সরিয়ে নিলো আস্তে আস্তে। রাস্তা দিয়ে বাউল গান গাইতে গাইতে কে যেন চলে গেল।]

রঞ্জন ॥ অনেক বেলা হয়েছে। যাও, স্নান করে নাও। কি—খাবার-দাবার নেই? ও, আমি বুঝি সব শেষ করে দিয়েছি? বড্ড খিদে পেয়েছিল বুঝলে? পুরো দুটো দিন পরে খেলাম কি না? —যাক, এখন কি করবে?

লোকটা ॥ এটা সরিয়ে ঠিক করতে হবে।

[লোকটা গুঁড়িটার কাছে গেল।]

রঞ্জন ॥ রান্না করে দেবো?

লোকটা ॥ ঘরে কিছু নেই।

রঞ্জন ॥ বা! আদর্শ সন্ন্যাসী! তাহলে কি করবে?

লোকটা ॥ পরে ভাবা যাবে।

রঞ্জন ॥ পরে কেন? খাবার ব্যাপারটা আগেই ভাবা দরকার। তাহলে তুমি কাজ করো। আমি কিছু কিনে নিয়ে আসি। —হ্যাঁ, কি কিনবো?

লোকটা ॥ কোথায় যাচ্ছিস?

রঞ্জন ॥ বাজারের দিকে

লোকটা ॥ না না। তোর গিয়ে কাজ নেই।

রঞ্জন ॥ তুমি না খেয়ে থাকবে? না না, তা হয় না (হেসে) আরে ভয় কিসের? আজ না হোক কাল—ধরা পড়বোই। যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন। …তুমি কাজ করতে থাকো। আমি চট করে ঘুরে আসি। [কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়ালো।]
—কিন্তু……(পকেট হাতড়ে টাকা বের করলো)

লোকটা ॥ কি হোল?

রঞ্জন ॥ মুশ্‌কিলে পড়লাম। এই টাকাগুলো জুয়ো খেলে পেয়েছি। এ দিয়ে কি তোমার জন্য খাবার কেনা ঠিক হবে? ..তার চাইতে তুমিই টাকা দাও।

[লোকটার চোখজোড়া ছলছল করে এলো। সামলে নিতে গুঁড়িটা সরাতে চেষ্টা করলো। পারলো না।]

রঞ্জন॥ তুমি সরো। আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

[রঞ্জন বুক বাধিয়ে অনায়াসে সরিয়ে দিল।]

লোকটা॥ বা! খাঁটি পুরুষের শক্তি পেয়েছিস।

রঞ্জন॥ বাবা তাই বলতেন। —কিন্তু সেদিন এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে ।ক যেন একটা পশুর তুলনা করলেন। (হেসে) তবে একটা বিপদ আছে। এতে বেশি খিদে পায়। আর খিদে পেলে টাকা চাই। আর টাকা পেতে গেলে হয় জুয়া, নয় ছিনতাই; নিদেন পক্ষে রাহাজানি। ...আরে! এটার ওপর কি খোদাই করছো? কিশোরী। ভারী সুন্দর হয়েছে! কী অপূর্ব চোখ! যেন কথা বলছে। কার মূর্তি?

[লোকটা তন্ময় হয়ে দেখছিল। প্রশংসায় লজ্জা পেল যেন।]

লোকটা॥ এসব কথা পরে হবে।...তুই ব'স্। আমি বাইরে যাচ্ছি একটু।

[প্রস্থানোদ্যত]

রঞ্জন॥ তোমার ঘর?

লোকটা॥ আমার ঘর—কি?

[প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুভব করে হাসলো লোকটা। এই প্রথম তার হাসি]

রঞ্জন লজ্জা পেয়ে মাথা নত করলো।]

লোকটা॥ যতোসময় না ফিরি—সাবধানে থাকিস। ছুরি-বোমার কথা মনে রাখিস না। এখন একটু হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমো। আর যদি পারিস, মনে মনে ঈশ্বর হ।

[ঘরের দরজা বাইরে থেকে টেনে দিয়ে চলে

গেল লোকটা। রঞ্জন নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছু সময়।]

রঞ্জন ॥ ঈশ্বর…ঈশ্বর…ঈশ্বর…ঈশ্বর…

[বিভিন্ন উচ্চতায় উচ্চারণ করলো রঞ্জন।]

—না! হচ্ছে না। মনোবম করে উচ্চারণই করতে পারছি না—আবার ঈশ্বর হবো! ধ্যেৎ! (আপন মনে হেসে উঠলো)

রঞ্জন ॥ ওর চাইতে শয়তান শব্দ উচ্চারণ করা অনেক সহজ।…শয়তান…শয়তান…ঈশ্বর…শয়তান ।

[খাটিয়ার ওপর শুয়ে বিড়াবিড করে কি যেন বলতে লাগলো। একটু পরে চুপ করলো। খুট্ করে শব্দ হোল দরজার। রঞ্জন ফিরে তাকালো। আস্তে আস্তে একটা মেয়ে ঢুকেই দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ালো। দরজা বন্ধ করে দিলো। মেয়েটি হাঁপাচ্ছে। চোখে-মুখে ভীতি। বয়স—কুড়ি-পঁচিশ। সাধারণ ভাবে দামী শাড়ী পরণে। বাইরে একটি পুরুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

নেপথ্যে ॥ সোনালী…সোনা…সোনালী…! সোনা, দরজা খুলে দাও!…সোনা দরজা খোল!…কথা শোন…সোনা—সোনালী!

[হঠাৎ ধাক্কা দিয়েই ঢুকে পড়লেন পরমেশবাবু। প্রবীণ বড়লোকী চেহারা। কণ্ঠস্বর শ্লেষ্মা-পীড়িত।]

সোনালী। না……… (ছিটকে সরে গেল)

পরমেশ ॥ এই যে !...তোমার পরমেশকে পেছনে পেছনে ছুটিয়ে দম বের করে দিয়েছো—সোনার হরিণী !...কী আশ্চর্য ! আমার পাকা ঘর ছেড়ে শেষ পর্যন্ত এইখানে! (কুশ্রীভাবে হাসি) মাইরী, তোমাকে এখন কি সুন্দর দেখাচ্ছে! ঠিক যেন—ঠিক যেন. । না, উপমা খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি উপমা বিহীন অনুপমা। হে হে হে · ·

—আ! সরে যাচ্ছো কেন ? তোমার বাবু পরমেশের কাছে তোমার লজ্জা! কিসের লজ্জা সখী প্রিয়ংবদে! শালা কানোয়ারীর কাছ থেকে কত কষ্ট করে তোমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম। এখন লজ্জা !···এসো ··এদিকে এগিয়ে এসো। আমি তোমায় আদর করবো। না না। শুধু হাতে নয়। টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে। অনেক অনেক দেবো··· ।

সোনালী ॥ চলে যান এখান থেকে।

পরমেশ ॥ উ! চলে যাবো ? নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই চলে যাবো। তবে একলা নয় সূর্যমুখী! তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যাবো সুন্দরী! মাইরী! তোমাকে আমি পৃথক ঘর দোবো।—আজীবন খোর-পোষ......

[খপ করে হাত ধরে ফেললেন পরমেশ।]

সোনালী ॥ হাত ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন!

পরমেশ ॥ হা হা হা হা!—আমার অনেক টাকার বিনিময়ে তোমাকে সংগ্রহ করেছি সখী কুন্দনন্দিনী। তুমি আমার ময়ুর সিংহাসনের প্রথম সোনা! ছাড়তে তো আমি পারবো না।

[হাসতে হাসতে সোনালীকে কাছে টানতে

থাকলেন। সোনালী প্রাণপণে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করলো।]

পরমেশ ॥ মাইরী। জোর করছো কেন? আমি তোমার জন্য টাকা খরচ করিনি? এসো—আ।

সোনালী ॥ ভগবান।

পরমেশ ॥ এখানে ভগবান আমি সোনালী—

[রঞ্জন এতো সময় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে লক্ষ্য করছিল। সোনালীর 'ভগবান' শব্দ কানে যেতেই লোকটার কথাটা প্রতিধ্বনিত হোল।

"এবার তুই ঈশ্বর হ।"

রঞ্জন ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিলো পরমেশের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তিনি। সোনালী শিশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে রঞ্জনের হাত জড়িয়ে ধরলো। রঞ্জন তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলো।]

সোনালী ॥ আমাকে আপনি—

রঞ্জন ॥ ভয় নেই সোনালী। আরে। আমাকে তুমি 'আপনি' বলছো কেন? আমি—আমি তোমার রঞ্জন। (পরমেশকে) এই যে মশাই! উঠে পড়ুন। এবার নেশা ছুটেছে? না—আরও একটু দরকার? (সোনালীকে) তা এ লোকটা কোত্থেকে এলো?—কই, আমাকে তো সেদিন রাতেও তুমি বললে না? (পরমেশকে) অমন করে তাকিয়ে লাভ নেই। ভগবান হতে

পারলেন না। সোনালীর আসল 'ভগবান' এসে গেছে।—কি কষ্ট হচ্ছে উঠে দাঁড়াতে ?

[পরমেশ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। প্রচণ্ড আঘাতে তিনি বে-সামাল। নিদারুণ শ্লেষে প্রায় উন্মাদ।]

পরমেশ ॥ বিশ্বাসঘাতিনী ...।

রঞ্জন ॥ আবে। কথাটা আজ প্রথম বুঝলেন নাকি ? আপনি দেখছি —নিতান্তই অর্বাচীন। একে বিশ্বাস করে সেই ছেলেবেলা থেকে আমি মশাই পথে পথে ঘুরে মরছি। (সোনালীকে)— কি—কথাটা ভুল বললাম ?

পরমেশ ॥ ঠিক আছে। আমাব টাকা-পয়সা যা গেছে যাক। কিন্তু এ অপমান—

রঞ্জন ॥ কেউ দেখতে পায়নি। চেপে যান। আমিও কাউকে বলবো না।

পরমেশ ॥ তোমাব মতো বারবণিতাকে—

রঞ্জন ॥ উঁহু। ঐ শব্দটা উচ্চারণ করবেন না। তাহলে কিন্তু আমি আবার 'ভগবান' হবো।

পরমেশ ॥ আচ্ছা !—তাহলে—

রঞ্জন ॥ খবরদার ! আর একটি শব্দও নয়—

[পরমেশ প্রতিহিংসার মনোভাব নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মুহূর্তে স্থানটি যেন নির্জন হয়ে পড়লো। সোনালী জড়োসড়ো। রঞ্জন জানালার কাছে নির্বাক। রঞ্জনের নিজেকে খুব মহৎ আর উদার মনে হচ্ছে।

রঞ্জন ॥ লজ্জা পাবার কিছু নেই। এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র। যে কারুরই জীবনে ঘটতে পারতো।—আপনি কিছু সময় বিশ্রাম করুন। তারপর যাবেন।

[প্রস্থানোদ্যত]

সোনালী ॥ কোথায় চললেন?

রঞ্জন ॥ বাইরে। আপনি খাটিয়ার ওপর বসে বিশ্রাম নিন। আমি বাইরে আছি।

সোনালী ॥ কিন্তু—(কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল)

রঞ্জন ॥ এখানে কিন্তুর কিছু নেই। যতক্ষণ ইচ্ছে থাকতে পারেন।

সোনালী ॥ যদি আবার—

রঞ্জন ॥ আসে? না, সে ভয় নেই। ও আর আসতে সাহস পাবে না।

সোনালী ॥ আপনি জানেন না ওরা কতো বড় সাংঘাতিক। একবার যখন—

রঞ্জন ॥ আপনি অনর্থক ভাবছেন। বাইরের কথা বলতে পারবো না। তবে এখানে যত সময়—তত সময় নিরাপদ।

সোনালী ॥ আপনি—আপনি আমার কি যে উপকার করলেন।

[সোনালীর কৃতজ্ঞতায় রঞ্জন যেন আরও উদার হোল।]

রঞ্জন ॥ আমি নতুন কিছুই করিনি। যে কেউ করতো।

সোনালী ॥ আমাকে যদি—(কথা শেষ করতে পারলো না)

রঞ্জন ॥ থামলেন কেন—? বলুন!

সোনালী ॥ আজকের সন্ধ্যে পর্যন্ত এখানে থাকতে দেন। রাতেই আমি চলে যাবো। শুধু—

রঞ্জন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এ আর এমন কি কথা।

সোনালী ॥ আপনার কোন অসুবিধে হবে না তো?

রঞ্জন ॥ না। সে ব্যাপারে আমি নির্মুক্ত। তবে—

সোনালী ॥ অন্য কোনও বাধা আছে?

রঞ্জন ॥ না না। বাধা নয়। তবে আমাব সঙ্গে আমার এক বৃদ্ধ বন্ধু থাকেন। তিনি হয়তো—

সোনালী ॥ তাহলে—? আমি একটু জায়গা পাবো না?

[সোনালীর এই আকুল প্রশ্নে রঞ্জন বিব্রত হোল। উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হোল। মুহূর্তকাল।]

রঞ্জন ॥ আচ্ছা এ কাজ করলে হয না? ধরুন, যতক্ষণ সে না আসে—

সোনালী ॥ তারপর তিনি এলে?

রঞ্জন ॥ এলে তখন যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

সোনালী ॥ কেন—আপনি আমাকে আশ্রয় দিতে পারেন না?

[এবার রঞ্জন বিপন্ন হোল।]

রঞ্জন ॥ হ্যাঁ পারি। পারবো না কেন?

[জোর করে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলো।]

সোনালী ॥ কিন্তু আমার পরিচয়? দিতে পারবেন?

রঞ্জন ॥ কেন পারবো না? বলবো—বলবো যে আমার এক পরিচিত বন্ধু, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

সোনালী ॥ কিন্তু সে তো মিথ্যে। কেন—আমার সত্যি পরিচয় দিতে পারবেন না?

রঞ্জন ॥ (বিচলিত হয়ে)—মানে— ?

সোনালী ॥ মানে, আপনি তো একটু আগেই দেখলেন আমি কে! কি করি! কি আমার জীবিকা! সেটা বলতে পারবেন না?

[কথাটা বলে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো সোনালী। রঞ্জন বিব্রত হয়ে চোখ নামালো।]

রঞ্জন ॥ না, মানে—এ পরিচয়ের দরকারই বা কি!

সোনালী ॥ তার মানে আমার আসল পরিচয় দিতে আপনি ভয় পাচ্ছেন! (হেসে) কিন্তু মিথ্যে পরিচয় দিতে আমিই যে রাজী হবো—এই বা কি করে ভাবলেন?

রঞ্জন ॥ দেখুন, আপনি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমার উদ্দেশ্য—

সোনালী ॥ খুব মহৎ! কিন্তু আমি তো সে মহত্ব চাইনি। আমি যা—ঠিক তাই থেকে—আমি আপনার কাছে আশ্রয় চেয়েছি। যা নই—তা হতে চাইনি।

[রঞ্জন জীবনে এই প্রথম বিভ্রান্ত হোল ।]

রঞ্জন ॥ কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে?

সোনালী ॥ উপায়! (অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে রঞ্জনকে সে দেখলো। নিঃশ্বাস ফেললো) না; আপনাকে আর উপায়ের কথা ভাবতে হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রঞ্জন ॥ মানে—! আপনি—?

সোনালী ॥ আমি চলে যাচ্ছি।

রঞ্জন ॥ কোথায় যাবেন? আপনার ঘরে?

সোনালী ॥ না। আমার ঘর নেই। যেখানে থাকতাম সেটা পরমেশের ঘর। ওখানে আর ফেরা যাবে না।

রঞ্জন ॥ খুব বিপদে পড়লেন তাহলে !

সোনালী ॥ বিপদ ! মনে হচ্ছে নাকি আপনার ? (হেসে) মনে হলেই বা কি করা যাবে।

রঞ্জন ॥ আপনি যাবেনই— ?

সোনালী ॥ যেতে আমাকে হবেই।

রঞ্জন ॥ কিন্তু এখন কি আপনার বাইরে যাওয়া ঠিক হবে ? বুঝে দেখুন। মানে একটু আগে যা ঘটে গেল, তাতে বাইরে গেলে বিপদে পড়তে পারেন।

সোনালী ॥ খুব ঝাঁজালো একটা জবাব মুখে এসেছিল। দিতে পারলাম না। কারণ পরমেশের হাত থেকে এখনকার মতো আপনি আমাকে রেহাই দিয়েছেন।···আচ্ছা—নমস্কার।

[প্রস্থানোদ্যত]

রঞ্জন ॥ শুনুন—আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই ?

সোনালী ॥ কতদূর যাবেন ? আমার সাময়িক আস্তানা অবধি ? তারপর যখন পরমেশের বদলে অমরেশ, অমরেশের বদলে কমলেশ আসবে ? যখন হাত-পা বেঁধে মদ খাওয়াবে ? যখন সারারাত ধরে কুকুরের মতো হাঁড় চিবোবে—তখন ?—তখন থাকতে পারবেন আমার সঙ্গে ?—(হেসে) পারবেন না। তার চাইতে এখানেই আপনি মহৎ থাকুন।

রঞ্জন ॥ আমি মহৎ নই।—বিশ্বাস করুন।

সোনালী ॥ হঠাৎ অসৎ হবার সখ জাগলো কেন রঞ্জনবাবু ? আমাকে কৃতজ্ঞ করতে ? (খিলখিল শব্দে হেসে) একটা বারবণিতার কৃতজ্ঞতা পেতে এতো লোভ ! ছি !

রঞ্জন ॥ আমাকে যতো ইচ্ছে আঘাত দিন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি মহৎ মানুষ নই।

সোনালী ॥ (হেসে)—ঠিক এই সুর, এই আবেগ নিয়ে আমার কাছে আরও দুজন মহৎ পুরুষ এসেছিলেন। কিন্তু কাদা দেখে তারাও শেষরক্ষা করতে পারেননি। তাই ও-কথা থাক। আপনি বরং আমাকে উপদেশ দিন। বিধাতার কাছে আমার জন্যে প্রার্থনা জানান। আমি প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে যাই।

[সোনালীর কথার আঘাত খেতে খেতে রঞ্জন আরও অসহায় হয়ে পড়লো। অস্থির আবেগে বিচলিত হয়ে পড়লো সে।]

রঞ্জন ॥ আমি মহৎ মানুষ নই সোনালী। বিশ্বাস করো, সমাজের চোখে আমিও তোমার মতো অপাংক্তেয়। আমিও একগলা পাঁকে দাঁড়ানো ঘৃণিত জীব।

সোনালী ॥ বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছে না।

রঞ্জন ॥ কেন বিশ্বাস করবে না তুমি ?

সোনালী ॥ আমাদের সান্ত্বনা দিতে কেউ কেউ পাপীর অভিনয় করে থাকেন। আর সে অভিনয় এতো নিখুঁত আর এতো স্বাভাবিক যে আমরা বিভ্রান্ত না হয়ে পারি না। (হেসে এবার গম্ভীর হোল)—তাই ওটা থাক রঞ্জনবাবু, আপনি যা—তাই থাকুন দয়া করে।

রঞ্জন ॥ আমি যা নই, তাই নিয়ে তুমি আমাকে বিদ্রূপ করছো।

সোনালী ॥ আপনি যা নন—তাই হতে চেয়ে আমাকে খুশি করতে চাইছেন।—যাক্ কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি চলি—

[প্রস্থানোদ্যত]

রঞ্জন ॥ দাঁড়াও—

সোনালী ॥ কেন? (সোনালী থমকে দাঁড়ালো)

রঞ্জন ॥ কি করলে তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে? যদি প্রমাণ করি যে আমি একটা জঘন্য জুয়াড়ী? সাংঘাতিক গুণ্ডা? ভয়ংকর বদমাস? যদি প্রমাণ দিই আমার সর্বাঙ্গে একরাশ পাপ?

সোনালী ॥ আমার জন্যে এতোটা প্রমাণ দিয়ে আপনার লাভ?

রঞ্জন ॥ লাভ? (রঞ্জন যেন শব্দটির অর্থ করতে পারলো না)

[খিল খিল শব্দে হেসে উঠলো সোনালী।]

সোনালী ॥ আপনি পারলেন না।—কিন্তু আমি বলতেও পারি। একটুখানি মহত্ব প্রকাশ। সামান্য একটু ভালো-মানুষী দেখানো। হঠাৎ আবেগে সাময়িক উদার হওয়া—তাই না?

[তীব্র চোবলে আঘাত করলো রঞ্জনকে।]

রঞ্জন ॥ সোনালী! (যন্ত্রণায় যেন কঁকিয়ে উঠলো)

সোনালী ॥ কিন্তু কেন?—আপনার কাছে আশ্রয় চেয়েছি সত্য—কিন্তু পাপীর প্রতি করুণা চাইনি। আমি পাপী। তাই বলে পুণ্যের ভণিতা দিয়ে পুণ্যবতী হবার সাধ আমার নেই। দেখলেন না—একটা পুরুষ আমার পেছন পেছন ছুটে এলো! শুনলেন না—ও আমাকে টাকা দিয়েছে? বুঝলেন না আমি ওর সওদা-করা পুতুল? এরপরেও আমাকে নিয়ে কেন এতো উপহাস?

[রঞ্জন উন্মাদের মতো হাত চেপে ধরলো সোনালীর।]

রঞ্জন ॥ না। উপহাস নয়। আমি যা—তাই হতে চেয়েছি মাত্র।

তুমি পাপী। তুমি বারবণিতা। তুমি একটা জঘন্য জীব
আমিও পাপী। খুনে। ঘৃণার পাত্র। তোমার আর আমার
মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।

সোনালী॥ কে বললো নেই? প্রভেদ আছে।

রঞ্জন॥ না নেই।

সোনালী॥ আছে। তুমি পাপ করে আবার সেটা অস্বীকার করতে পারো। আমি পাপ করলে সে পাপের দাগ আর মোছে না। তুমি ক্ষত-বিক্ষত হয়েও ঢাকা দিতে পারো আবার, কিন্তু আমি পারি না।—একবার কাদায় নামলে গঙ্গার জলেও ধুয়ে-মুছে ফেলতে পারি না সেই দাগ। (ডুকরে যেন কেঁদে উঠলো)

[হঠাৎ রঞ্জনের দৃষ্টি জানালা দিয়ে বাইরে পড়লো। কেঁপে উঠলো সে।]

রঞ্জন॥ সেই লোকটা লোকজন নিয়ে আসছে সোনালী।

সোনালী॥ তাই নাকি। (অবজ্ঞা ফুটে উঠলো কণ্ঠস্বরে)

রঞ্জন। এখুনি পালাতে হবে সোনালী

সোনালী॥ কেন? পালাবো কেন? —কিসের ভয়?

রঞ্জন॥ নইলে তোমাকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। তুমি রেহাই পাবে না।

সোনালী॥ ধরে নেবেই তো। ধরার জিনিষ ধরবে না?

রঞ্জন॥ এবার ও তোমার ওপর ভয়ংকর প্রতিশোধ নেবে সোনালী। তুমি বুঝতে পারছো না।

সোনালী॥ নিক্— প্রতিশোধ নিক্। আমি তো তাই চাই।

রঞ্জন॥ (উন্মাদের মতো হাত ধরে) না—না—না সোনালী। তুমি

তা চাও না। —তুমি ওদের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাও। তুমি বাঁচতে চাও—

সোনালী॥ (হাত ছাড়িয়ে) কে বললো? —মিথ্যে কথা। আমি চাই না। সরে দাঁড়াও…

রঞ্জন॥ সোনালী…! (গর্জে উঠলো যেন)

[খিল খিল করে অর্ধোন্মাদের মতো হেসে উঠলো সোনালী।]

সোনালী॥ বড় মিষ্টি তুমি রঞ্জন। —বড়ো লোভ হয়! কিন্তু আমি যে পাপী! আমার অনেক দূরের তুমি! —আমাকে ছেড়ে দাও। —ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাক্। যেখানে খুশি! যতদূরে খুশি! আমি বাঁচতে চাইনে রঞ্জন ··তুমি ছেড়ে দাও··

[হাসতে হাসতে কেঁদে ফেললো সোনালী। রঞ্জন আর বিভ্রান্ত হোল না। সোনালীর মুখ চেপে ধরে টানতে টানতে কোণের পর্দা-ঘেরা জায়গায় আত্মগোপন করলো ওরা। একটু পরে হৈ-চৈ করতে করতে প্রবেশ করলেন পরমেশবাবু। সঙ্গে সেই তিনজন লোক। ওরা ঢুকেই দেখে ঘর ফাঁকা।]

প্রথম॥ কই মশাই—কোথায় আপনার স্ত্রী?

পরমেশ॥ এইখানে সেই গুণ্ডাটা আমাকে ঘুঁষি লাগিয়েছিল। —ঠিক এইখানে।

দ্বিতীয়॥ মশাই লোকটার পরনে কালো রঙ-এর প্যাণ্ট ছিল?

তৃতীয়॥ গায়ে সাদা হাফ্ সার্ট?

প্রথম॥ চোখে কালো চশমা?

পরমেশ ॥ হ্যাঁ, বোধহয় তাই ছিল।

প্রথম ॥ বোধহয় কি? ভালো করে মনে করে দেখুন—লোকটার হাতে ছুরি ছিল কিনা?

দ্বিতীয় ॥ লক্ষ্য করেছেন—কপালে একটা কাটা দাগ?

তৃতীয় ॥ বুঝতে পেরেছিলেন কি যে পকেটে তার পিস্তল ছিল?

[পরমেশ এদের সমবেত প্রশ্নে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন।]

পরমেশ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে। এইখানে সে আমাকে ঘুঁষি মেরে আমার স্ত্রীর হাত চেপে ধরেছিল।

প্রথম ॥ আপনার স্ত্রী চিৎকার করেছিলেন?

দ্বিতীয় ॥ আপনি লোকজন ডেকেছিলেন?

তৃতীয় ॥ উঠে দাঁড়িয়ে আঘাত করলেন আপনি?

পরমেশ ॥ দেখুন, আমি সব করেছিলাম। কিন্তু কিছুই কাজ হোল না। আপনারা দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করুন।

প্রথম ॥ কি আর করবো? আপনি নিজেই কিছু করতে পারলেন না।

দ্বিতীয় ॥ আপনি মশাই নিজেই ভয়ে একশেষ। পুলিশে সংবাদ দিন।

তৃতীয় ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—তাই দিন। আমাদের এখন অনেক কাজ আছে। ওহে চলো চলো—(প্রস্থানোদ্যত)

পরমেশ ॥ শুনুন শুনুন। আমার মনে হচ্ছে গুণ্ডাটা বেশিদূর যেতে পারেনি। কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে। আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না?

[ওরা সকলে গোল হয়ে দাঁড়ালো। ওদের মধ্যে চললো গোপন পরামর্শ। চারজনের মূকাভিনয় শেষ হতেই ওরা আবার কথা বললো।]

প্রথম ॥ ঠিক আছে। আমরা রাজি।

দ্বিতীয় ॥ টাকাটা আগাম চাই।

পরমেশ ॥ হ্যাঁ দেবো।

তৃতীয় ॥ পুলিশের হাঙ্গামা হলে আপনাকে সামলাতে হবে

পরমেশ ॥ সামলাবো।

প্রথম ॥ বেশ, চলুন···। ওহে চলো তোমরা।

[ওরা চলে গেল। ধীরে ধীরে সোনালীর হাত ধরে রঞ্জন বেরিয়ে এলো। রঞ্জন জানালা দিয়ে রাস্তা দেখলো। সোনালী নির্বাক। তার মধ্যে যেন ঝড় বইছে।]

রঞ্জন ॥ ওরা অনেকদূর চলে গেছে।

[সোনালী জবাব দিল না।]

রঞ্জন ॥ আর দেরি নয়। এখুনই বেরিয়ে পড়তে হবে।···প্রথমে কোন একটা দোকানে গিয়ে জামা-কাপড় কিনতে হবে। তারপর হোটেলে খেয়ে সোজা চলে যাবো—স্টেশন ওয়েটিং-রুমে। ···সেখানে পোষাক পালটাবো আমরা। তারপর আমরা রওনা দেবো। —প্রথমে কোন তীর্থস্থানে যাওয়াই ভালো। —কিছুদিন পরে শহরে ফেরা যাবে। ···এখন এদিকে পুলিশের হামলা চলবে···। না, আর দেরি করা উচিত হবে না সোনালী।

সোনালী ॥ আমি যাবো না—।

রঞ্জন ॥ কি বলছো? (যেন বিশ্বাস করতে পারছে না)

সোনালী ॥ আমি আবার ঘরে ফিরে যাবো।

রঞ্জন ॥ ওই লোকটার কাছে!

সোনালী ॥ হ্যাঁ—ওই লোকটার কাছে। ওর মতো আরও অনেকের কাছে।

রঞ্জন ॥ ওরা তোমাকে—

সোনালী ॥ অপমান করবে? (অদ্ভুত হেসে) করুক না। আবার টাকাও দেবে। প্রচুর টাকা। অনেক আরাম—অফুরন্ত নেশা। আমি তোমার সঙ্গে যাবো না। আমি স্বস্তি চাই। ওরা একহাতে মারে, অন্যহাতে সোহাগ জানায়। আমি এখন তাই চাই—। (প্রস্থানোদ্যত)

রঞ্জন ॥ সোনালী—(রঞ্জন যেন প্রায় উন্মাদের মতো পথ আটকে দাঁড়ালো।)

সোনালী ॥ খবরদার! আমাকে বাধা দেবে না। কি আছে তোমার যে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে? —কিছু নেই। ওদের মতো সাহস নেই; ওদের মতো শক্তিও নেই—।

রঞ্জন ॥ চুপ কর। নইলে তোকে শেষ করে দেবো।

[রঞ্জন নেকড়ের মতো গলা চেপে ধরলো সোনালীর। ভয়ংকর হিংস্রতা জেগে উঠলো তার চোখে-মুখে। সোনালী ভয় পেলো না। মুক্ত করতে চেষ্টাও করলো না নিজেকে। রাস্তায় বিয়ের বরযাত্রীদের সানাই বেজে উঠলো। আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে এলো রঞ্জনের হাত। সে যেন একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে।]

রঞ্জন ॥ না…আমার কিছু নেই…সত্যিই— আমার কিছু নেই…

[এবার সোনালী হাত চেপে ধরলো

রঞ্জনের। দুজনে নির্বাক। দুজনের চোখে জলের ধারা।]

সোনালী॥ এসো⋯ !

[ঘরের দরজা খোলা রইলো। ওরা দুজনে অনন্ত কথা বুকে নিয়ে নির্বাক বেরিয়ে পড়লো পথে।]

—অন্ধকার—

[মঞ্চে আবার আলো জ্বললো। সেই একই দৃশ্য। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘর আবছা অন্ধকার। দূরে দেবালয়ে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। মন্ত্র ও ঘণ্টাধ্বনি ধীরে ধীরে স্তিমিত হোল। সেই বুড়ো লোকটা কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো। হাতে পূজার ফুল।]

লোকটা॥ রঞ্জন…ভারী মজা হয়েছে…স্নান করে উঠতেই মন্দিরের কথা মনে পড়লো। অনেকদিন তো ও-পথ মাড়াইনি ••ভয়ে ভয়ে গেলাম ··বুঝলি রঞ্জন—মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে আমার হঠাৎ নিজেকে অপরাধী বলে মনে হোল…জীবনে অনেক পাপ করেছি কিনা!…রঞ্জন, বুকে সাহস রেখে পূজা দিয়ে এলাম …না না, আমার জন্যে নয় ..আমার জন্য কোন প্রার্থনা করিনি...আমার নিজের কথা বলতে বড়ো লজ্জা হয়…হ্যাঁ, তোর কথা মনে হয়েছিল…আয়, উঠে আয়—ফুল নিবি...আর প্রার্থনা করবি—।

[অভ্যস্ত কাজ করতে করতে কথা বলছিল লোকটা। হঠাৎ খেয়াল হোল রঞ্জনের সাড়া নেই। থমকে দাঁড়ালো।]

—রঞ্জন—রঞ্জন——ঘুমিয়ে পড়েছিস্—রঞ্জন—

[দ্রুত এগিয়ে গেল। চারিদিক দেখলো।]

রঞ্জন——(ভীত স্বর অদ্ভুত শোনাল) চলে গেছে——!

[কয়েক মুহূর্ত বোবা হয়ে রইলো যেন।]

লোকটা॥ চলে গেল—আমাকে ফেলে——(কথা শেষ হোল না) না বলেই চলে গেল—। (হঠাৎ রেগে) যাক্—। চলে যাক। যেখানে খুশি চলে যাক্। —আমার কি! আমি তার—! অপদার্থ! উড়ে উড়ে চলতে চায়। যাক্, বাঁচা গেছে—! আপদ বিদেয় হয়েছে! দূর দূর!

[কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সহসা চিৎকার করে উঠলো।]

—আসুক আবার—। এবার ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবো—। মুখও দেখবো না। দূর-দূর-!

[খাটিয়ায় ওপর বসলো।]

—সবাই—কেউ বাকি নেই—ছেলে-মেয়ে-বৌ—সবাই শয়তান আর স্বার্থপর! —আমাকে একেবারে শেষ করে দিল! —বিশ্বাসঘাতকের দল—!

[যন্ত্রণায় মুখখানা যেন ভেঙে গেল। পুলিশের প্রবেশ।]

পুলিশ॥ এই বুড্ডা; কি বাত বানাচ্ছিস্? —হারে! আমাকে চিনতে পারছিস না? —কিরে! হাঁ করে কি দেখছিস?

লোকটা॥ আমি রাজি। (হঠাৎ অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে কথা বললো)

পুলিশ॥ কিসের রাজি?

লোকটা॥ তোমার কথায় আমি প্রস্তুত।

পুলিশ॥ কি বক্ বক্ করছিস? বল।

লোকটা॥ আমি ব্যবসা করবো।

পুলিশ॥ সাচ্ মুচ্! কি বলছিস্?

[পুলিশের চোখে-মুখে লোভের চিহ্ন।]

লোকটা ॥ যতো পাপ হোক, যতো ঘৃণ্য হোক, আমি তোমার সঙ্গে ব্যবসায় নামবো। টাকা চাই আমার। অনেক টাকা। প্রচুর টাকা। টাকা ছড়িয়ে সমস্ত সংসারটাকে বেঁধে ফেলবো। তারপর চাবুক মেরে—

পুলিশ ॥ (সানন্দে) সত্যি! সত্যি বলছিস? হামার সঙ্গে তু তো দিল্লাগী করছিস না?

লোকটা ॥ আমি একবার অন্যায়কে পরখ করে দেখতে চাই।—আজ থেকে ব্যবসা সুরু করবো। যত নীচে নামতে হয়—আমি নামবো।

পুলিশ ॥ আজই?

লোকটা ॥ হ্যাঁ, আজ রাত থেকে। যাও, তুমি ব্যবস্থা করো। আমি দেরি করতে রাজী নই।

পুলিশ ॥ সাবাস। এই তো চাই। এতোদিন পরে বুড্ডা তোর মগজ সাফ হয়েছে। হে হে হে হে।

লোকটা ॥ যাও, দেরি কোরো না। বেশি দেরি করলে আমি হয়তো অবশ হয়ে পড়বো। যাও, তাড়াতাড়ি যাও।

পুলিশ ॥ হাঁ হাঁ, যা রহে। লোকিন ইয়াদ রাখনা—

লোকটা ॥ আ। (গর্জে উঠলো যেন)

পুলিশ ॥ (ভয়ে) শালা পাগল বনিযে গেল নাকি?

[দ্রুততার সঙ্গে প্রস্থান।]

[কিছু সময় নির্বাক থেকে হঠাৎ হেসে উঠলো লোকটা।]

লোকটা ॥ বড় মজা! সবাই পাপের আনন্দ ভোগ করবে—আর আমি পুণ্যের দরজা পাহারা দেবো। বড় মজা পেয়ে গেছো সবাই। (একবার দম নিয়ে) সারাজীবন ওদের পাপের বোঝা বইতে

বইতে বুকের পাঁজরটা গুড়ো হয়ে গেল। বৌ-ছেলে-মেয়ে-বন্ধু মিথ্যে। সব মিথ্যে আর ফাঁকিবাজি।

[উঠে গুড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।
কথা বলা স্থরু করলো আবার।]

—বুক দিয়ে আগলেছিলাম...মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মানুষ করেছিলাম...না খেয়ে মুখের খাবার তুলে দিয়েছিলাম......একটু একটু করে স্বপ্ন গড়েছিলাম...তাই না? আর তার বিনিময়ে—লজ্জা, ঘৃণা আর অপমান।

[কথা বন্ধ হয়ে গেল যেন।]

—না। বেঁচে নেই.. বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই তোর ..তুই মরে গেছিস .

[হঠাৎ কুড়ুলটা নিয়ে গুঁড়িটার ওপর কোপ বসাতে থাকলো জোরে জোরে।
এই সময় এই ঘরের ওপরের ঘরে করুণ স্বরে একটা বেহালা বাজছিল। কুড়ুলের শব্দে থেমে গেল বাজনা।
"কি হচ্ছে—এটা কি হচ্ছে...আবার স্থরু হয়েছে"—বলতে বলতে হরনাথের প্রবেশ।]

হর॥ কি হচ্ছে এটা? এটা কি পাগলা-গারদ পেয়েছো?

লোকটা॥ (কুড়ুল রেখে) কি বলছেন?

হর॥ (খেঁকিয়ে) কি বলছেন? বুঝতে পারছো না কি বলছি? পাগলের মতো ওটার ওপর কুড়ুল চালাচ্ছো কেন?

লোকটা॥ কেটে ফেলছি।

হর ॥ কেটে ফেলছি। ঘরের মধ্যে বসে মাতলামী লাগিয়েছো? ওপরে লোকজন বাস করে সেটা খেয়াল আছে?

লোকটা ॥ আমি কি করতে পারি?

হর ॥ তুমি চলে যেতে পারো।

লোকটা ॥ (বিস্ময়ে) চলে যাবো।

হর ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, চলে যাবে। দোহাই তোমার। দয়া করে এখান থেকে বিদেয় হও। আমাদের হাড়ে বাতাস লাগুক।

লোকটা ॥ বেশ, তাই যাবো।

হর ॥ হ্যাঁ, তাই যাও। আমরা বাঁচি। দিন নেই—রাত নেই—(হঠাৎ থেমে) কোথায়? সে কোথায়?

লোকটা ॥ কে?

হর ॥ ঐ যে গুণ্ডা চেহারার বদমাস ছেলেটা? যে আমাকে চোখ উঁচু করে কথা বলেছিল? কি? কোথায় সে? বলি—বোতল টেনে কোথাও বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে? না গুণ্ডামী করতে গেছে?

লোকটা ॥ আমি জানি না।

হর ॥ (ব্যঙ্গ) জানো না? না—জেনে না জানার ভান করছো? বলি মন্দ জোটাওনি। শয়তানের সঙ্গে বদমাসের মানিকজোড়। আমার ওপর চোখ রাঙিয়েছিল তাই না? বলে দিও ঐ রাঙা চোখে জল ঝরার সব ব্যবস্থাই আমি করে রেখেছি। সে যেন প্রস্তুত থাকে।

লোকটা ॥ তার কথা তাকেই বলবেন। আমাকে বলছেন কেন?

হর ॥ কি, আমাকে ধমক দেওয়া হচ্ছে? তোমাকে বলবো কেন? আমি তোমার প্রজা? না ভাড়াটে? কি মনে হচ্ছে? ঠিক

আছে। তোমার ধমকের জবাব আমি দিচ্ছি। তিনদিন নয়; আজ। আজ রাত পোহাতেই তুমি আমার ঘর ছাড়বে। আর একটি দিনও নয়। কাল সকাল বেলায় যদি আমার ঘরের মধ্যে আবার তোমাকে দেখি তাহলে চাকর দিয়ে ঘাড ধাক্কা দিয়ে বের করে দোব। মনে থাকে যেন। (একটু থেমে) কোথা থেকে শয়তানেব দল এসে জুটেছে।

[বাগে কাঁপতে কাঁপতে হরনাথ বেরিয়ে গেলেন। নেপথ্যে তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

নেপথ্যে হরনাথ ॥ আজকেব রাতটুকু কাল সকালেই পথে বের করে দেবো। যেমন 'কালপ্রিটে'র মতো দেখতে, তেমনি খুনীর মতো স্বভাব। কবে আবার কার সর্বনাশ করে বসে--কে জানে?

[লোকটা নির্বাক। সে যেন পরাজিত। হঠাৎ দুহাত প্রসারিত করে যেন কেঁদে উঠলো।]

লোকটা ॥ আমাকে একটু কাঁদতে দাও।

[চারিদিকে নির্জনতা। অন্ধকার ঘর। লোকটা নিঃশব্দে বসে। ওপরের ঘরের নারী-পুরুষ কণ্ঠের হাসি ভেসে আসছে মাঝে মাঝে।

হঠাৎ দরজায় খুট্ করে শব্দ উঠলো। অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করলো……রঞ্জন আর সোনালী।]

সোনালী ॥ উঃ! কী অন্ধকার! কিছুই দেখা যাচ্ছে না!

রঞ্জন ॥ বুড়োটা বোধহয় ঘরে নেই।

সোনালী ॥ ঘুমিয়েও পড়তে পারে। উঃ!

[সোনালী ধাক্কা খেলো।]

রঞ্জন ॥ কি হোল? ধাক্কা খেলে সোনালী?

সোনালী ॥ আমার বড় ভয় করছে রঞ্জন।

রঞ্জন ॥ দাঁড়াও। আলোটা জ্বালি।

সোনালী ॥ না থাক। অন্ধকারের মধ্যে বেশ আছি। আলো জ্বালতে হবে না।

রঞ্জন ॥ আমি তোমাকে যে দেখতে পাচ্ছিনে।

সোনালী ॥ হাত ধরে থাকো। কই, হাতখানা বাড়িয়ে দাও। এ কি, হাত ঠাণ্ডা কেন?

রঞ্জন ধেৎ। অন্ধকারের মধ্যে এসব ন্যাকামী ভালো লাগে না। এবার আলো চাই।

খিল খিল শব্দে হেসে উঠলো সোনালী।

রঞ্জন ॥ হাসছো যে?

সোনালী ॥ তোমার কথা শুনে।

রঞ্জন ॥ হাসির কি হোল?

সোনালী ॥ তুমি যোগী হতে পারলে না।

রঞ্জন ॥ তার মানে?

সোনালী ॥ অন্ধকারে ধ্যান করতে পারছো না। কেবল আলো-আলো করছো।

রঞ্জন ॥ সত্যি—কি সুন্দর তুমি কথা বলতে পারো।

সোনালী ॥ পছন্দ হচ্ছে?

রঞ্জন ॥ দারুণ পছন্দ হচ্ছে।

সোনালী ॥ এবার তাহলে আলোটা জ্বালো।

রঞ্জন ॥ মানে—

সোনালী ॥ দেখা যাক্ পছন্দটা আলোর মধ্যে টেঁকে কি না!

[ওরা দুজনে হেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে কোণের দিকে আলো জ্বালালো লোকটা। মুহূর্তে হাসি থেমে গেল ওদের।]

সোনালী ॥ (ভয়ে) ও কে?

রঞ্জন ॥ সেই লোকটা।—শীগ্‌গীর মাথায় ঘোমটা দাও।

সোনালী ॥ বাপ্‌রে! কি ভয়ংকর দেখতে।

[সোনালী দ্রুত মাথায় ঘোমটা টেনে নববধূ হোল।]

রঞ্জন ॥ এই যে আমরা! আমি···আমি রঞ্জন।

[লোকটা এগিয়ে এসে আলো ধরে দেখলো। নির্বাক।]

রঞ্জন ॥ (হেসে) আসতে একটু দেরি হয়ে গেল।—মানে অনেকটা পথ তো। গাড়ি না পেয়ে হেঁটেই আসতে হোল। আমি তো ভেবেছিলাম—আরও দেরি হবে।

[লোকটা অন্যদিকে সরে গেল।]

রঞ্জন ॥ ভেবেছিলাম হয়তো তোমাকে ঘুম থেকেই ওঠাতে হবে।—হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। বাবা!—যে করে আসা!—যাই বলো, গাড়ি না থাকলে সুখ নেই।

লোকটা ॥ আর কোন কথা আছে?

রঞ্জন ॥ (আরো স্বাভাবিক ভঙ্গীমায়) একবার ভেবেছিলাম রাত হয়ে যাচ্ছে যখন, তখন পথে কোথাও থেকে যাই! ধরো হোটেল

—কিংবা সরাইখানা। একবার ঢুকেও গিয়েছিলাম।—তারপর মনে হোল তুমি হয়তো রাতভোর ঘুমোতেই পারবে না।—তার চাইতে চলে আসাই ভালো।

লোকটা ॥ তোমার কথা শেষ হয়েছে ?

রঞ্জন ॥ না, মানে আমার খিদে নেই—বুঝলে ? রাতে খাবো না। না না, শরীর খারাপ হয়নি। এমনিতেই খিদে নেই। তাছাড়া দুপুরে যা খাইয়েছিলে,—এখন দুদিন না খেলেও চলবে।

লোকটা ॥ তোমার কথা শেষ হলে আমি দরজা বন্ধ করতে পারি।

রঞ্জন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। রাত হয়ে গেছে। ঘুমোবার দরকার। তাছাড়া যা হেঁটেছি। চোখ ভেঙে ঘুম আসছে। যেন একমাস ঘুমোইনি। কিন্তু—

লোকটা ॥ কিন্তু আমি একলা ঘুমোবো।

রঞ্জন ॥ (বিস্ময়ে) মানে ! আমি, মানে আমরা—

লোকটা ॥ (হঠাৎ রাগে ফেটে পড়লো)—তার মানে ! মানে জানতে চাও ? এটা কি তোমার মৌরসী পাট্টা-করা সম্পত্তি ? যে ইচ্ছে মতো তুমি থাকবে ? খুশি মতো আসবে-যাবে আর ঘুমোবে ?

[রঞ্জন সোনালীর সামনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো।]

রঞ্জন ॥ আরে, তুমি ক্ষেপে গেলে নাকি ?

লোকটা ॥ চুপ করো ! এটা তোমার নিজের ঘর নয়—যে ইচ্ছে মতো যথেচ্ছাচার করবে। অনেক জায়গা আছে তোমার। সেখানে যাও। যা ইচ্ছে করো, যতো খুশি করো—এখানে নয়।

[অন্যদিকে সরে গেল।]

রঞ্জন ॥ আরে, শোন শোন। রাগ করছো কেন? সত্যিই আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছিল। তোমাকে বলে যাবার সময় পাইনি। বিশ্বাস করো—ওকে আমি তাই বলছিলাম—

লোকটা ॥ বিশ্বাস' শব্দটা উচ্চারণ করো না। তাহলে শব্দটা কেঁদে উঠবে।—ও কে?

ইঙ্গিতে পেছন-ফেরা সোনালীকে দেখালো। রঞ্জন জবাব দিতে ইতস্ততঃ করতে থাকলো।]

—কে ও?

রঞ্জন ॥ সোনালী।

লোকটা ॥ এখানে কেন? কি চাই ওর?

রঞ্জন ॥ ও এখানে থাকবে।

লোকটা ॥ আমি বুঝতে পারছি না যে আমি পাগল হয়েছি—না তুমি উন্মাদ হয়েছো? (চিৎকার করে) এখানে ও থাকবে কেন?

রঞ্জন ॥ আ! চিৎকার করছো কেন? আগে শুনেই নাও না—আমি···—

লোকটা ॥ আমি জানতে চাই—কে তোমাকে অধিকার দিয়েছে এসব? ও কেন এখানে থাকবে?

রঞ্জন ॥ ও থাকবে—যেহেতু আমি থাকবো।

লোকটা ॥ (ক্ষেপে গিয়ে) বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এখান থেকে। এটা তোমাদের আমোদ-ফূর্তির জায়গা নয়—যে যাকে খুশি নিয়ে এসে রাত কাটাবে।

রঞ্জন ॥ আরে তুমি ভুল করছো। আগে আমার কথাটা শোন—তারপর—

লোকটা ॥ কোন কথা নয়। আমি চাই তুমি এখুনই ওকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। নইলে আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করে তোমাদের স্বরূপ—

সোনালী ॥ থাক্। অনেক দয়া দেখিয়েছেন আপনি। অনুগ্রহ করে লোক জড়ো করে অপমান করতে হবে না। পথে বের করে দেবার সততা লোকজন ডেকে না দেখালেও চলবে। এসো রঞ্জন।

[আকস্মিক সোনালীর দৃঢ় কণ্ঠস্বরে বিব্রত রঞ্জন বিমূঢ় হোল।]

রঞ্জন ॥ সোনালী—আসলে ব্যাপারটা কিন্তু—

সোনালী ॥ না রঞ্জন। কোন কিন্তু নয়। এতো বড়ো পুণ্যের রাজত্বে তোমার-আমার ঠাই হবে না। আমরা অন্ধকারের জীব। এসো, আমরা অন্ধকার পথেই বেরিয়ে পড়ি।

[হঠাৎ মুহূর্তটি যেন বোবা হয়ে গেল।]

সোনালী ॥ ভুল কোর না রঞ্জন। তোমার-আমার গায়ে পাপের দাগ। আমরা ওদের কাছে ভিক্ষে চাইতে পারি। কিন্তু দাবী করতে পারিনে। এসো দেরি কোর না—

[বিব্রত রঞ্জন ইতস্ততঃ করে সামলে নিলো নিজেকে।]

রঞ্জন ॥ যতটা দাবী করা উচিত তার চাইতে বেশিই করে ফেলেছিলাম। তাই তোমার কথায় দুঃখ পাচ্ছিনে। জীবনে এমন পুরস্কার আমার অনেক জুটেছে।.........সোনালীকে নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম, কারণ আমার মনে হয়েছিল—পাপীকে তুমি ক্ষমা করতে পারো। ওকেও তাই বলেছিলাম।

—তোমাকে আর বিরক্ত করবো না। আচ্ছা চলি। এসো সোনালী—

[ওরা প্রস্থানোদ্যত হতেই ছুটে গিয়ে দরজা আগলে দাঁড়ালো লোকটা।]

লোকটা॥ পৃথিবীতে কি কেবল আমিই দুঃখ পেতে এসেছি? যত আঘাত সবই বুঝি আমাকেই বইতে হবে? যত অপরাধ সে কেবল আমার?

রঞ্জন॥ কি বলছো তুমি?

লোকটা॥ যদি তাই হয় তাহলে আমাকে তুই শাস্তি দে—

[পিতা হয়ে পুত্রকে শাসন করার মতো চড় দিলো রঞ্জনকে। তারপর হাঁউ-হাঁউ করে কেঁদে ফেললো।]

—আমাকে তোরা একেবারে শেষ করে দে……।

[আবেগে পড়ে যাচ্ছিল লোকটা। রঞ্জন ধরে ফেললো।]

রঞ্জন॥ আমি—আমরা যাবো না।

লোকটা॥ আমাকে ক্ষমা কর মা। মাঝে মাঝে আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে ওঠে। আমি তখন পাগলের মতো হয়ে যাই। (একটু দম নিয়ে)—এ-ঘর ছেড়ে কাল আমাকে চলে যেতে হবে। সকালে আমরা একসঙ্গেই পথে বের হবো।

[রঞ্জন হঠাৎ শিশুর মতো নেচে উঠলো।]

রঞ্জন॥ আরে! কথাটা আগে বলতে হয়। কী আশ্চর্য! তুমিও তাহলে আমাদের সাথী!—কি মজা! (হা হা শব্দে হেসে) —সোনালী, এবার আমরা তিনটে মানুষ। আমি পাপ। তুমি

ঘৃণা। আর ও অপমান। তিনে মিলে শয়তানের রাজত্ব। হা হা হা হা! (লোকটাকে) শোন! একটা কথা আছে। আমরা কিন্তু সূর্য ওঠার আগেই রওনা দেবো। কেউ জানতে পারবে না। কেউ বুঝতে পারবে না—আমরা কোথায় গেলাম, আর কখন গেলাম। যেন আমরা স্বর্গের দেবদূত। (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) উপমাটা ঠিক হোল তো?

লোকটা॥ মূর্খ! (কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করলো)

রঞ্জন॥ সে তুমি যাই বলো—এখন দেবদূত হতে বড়ো লোভ হচ্ছে। (হঠাৎ সচেতন হয়ে) হ্যাঁ, আর একটা কথা! আমরা কোথায় যাবো—তাও আগে ঠিক করবো না। হাঁটতে হাঁটতে যেখানে পৌঁছাবো—সেইটেই হবে আমাদের গন্তব্য। আ! কি মজা!

লোকটা॥ এ কি! তুমি দাঁড়িয়ে কেন মা? ব'সো।—তোদের খাওয়া-দাওয়ার কি হবে রঞ্জন?

রঞ্জন॥ হ্যাঁ, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। কি করা যায় বলো তো?

লোকটা॥ সে কি! এই একটু আগে না বললি—খিদে নেই। পেট ভরা আছে।

রঞ্জন॥ ভয়ে বলেছিলাম।

[এবার ওরা তিনজনে হেসে উঠলো। সহজ হয়ে গেল ওদের সম্পর্ক।]

লোকটা॥ অপদার্থ!

রঞ্জন॥ বাবা-মা দুজনেই বলতেন। অথচ আমার মনে হোত—আমার মধ্যে পদার্থ আছে। একদিন কলেজের প্রফেসরকে—(হঠাৎ থেমে)—দূর, আসল কথা ছেড়ে যাচ্ছি। খিদে পেয়েছে, খেতে দাও।

লোকটা ॥ তোরা ব'স্। দেখি—

রঞ্জন ॥ হাঁড়িতে যদি কিছু থাকে তাই দাও। ভাগাভাগি করে হয়ে যাবে। এসো সোনালী।

[সোনালী রঞ্জনের কাছে বসলো। হাঁড়ি ধরে খাবাব নিয়ে এলো লোকটা। গোল হয়ে বসলো ওরা, যেন মরুভূমিতে ছাউনি ফেলা তিনটি মানুষ।]

লোকটা ॥ ও হো! ভুলে গিয়েছিলাম—

রঞ্জন ॥ কি হোল আবার ?

লোকটা ॥ অনেকদিন পরে আজ হঠাৎ মন্দিরে যেতে ইচ্ছে হোল। গিয়েওছিলাম। পূজার ফুল আছে। ব'স্ নিয়ে আসি।

[লোকটা উঠে ফুল আনলো।]

রঞ্জন ॥ করেছো কি ? শেষ পর্যন্ত মন্দিরে ছুটেছো ? দাও—

[ওরা দুজনে নত হয়ে ফুল নিলো।]

রঞ্জন ॥ কি প্রার্থনা করেছো ?

লোকটা ॥ তা বলতে নেই।

রঞ্জন ॥ মা-ও ঠিক এই কথা বলতেন। (হেসে) একদিন কিন্তু মার প্রার্থনা শুনে ফেলেছিলাম।

লোকটা ॥ তাই নাকি ?—কি প্রার্থনা করেছিলেন ?

রঞ্জন ॥ সে এক মজার প্রার্থনা। বলেছিলেন—ঠাকুর আমার রঞ্জনকে—

নেপথ্যে ॥ এই বুড়ো—। ঘরে আছো নাকি ?

রঞ্জন ॥ দেখো কে ডাকছে তোমাকে।

[লোকটা বিরক্তি নিয়ে উঠে গেল।]

সোনালী। আমার কিন্তু মার কথা মনে নেই।

রঞ্জন॥ না থাকাই ভালো। অনেক জ্বালার হাত থেকে বাঁচা যায়।

সোনালী॥ আবার ঘুমও আসে না। তখন ঘুমোতে মদ খেতে হয়।

রঞ্জন॥ অথচ পুণ্যবান লোকের কাছে মদ খাওয়া পাপ।

সোনালী॥ ওদের যে মায়ের মুখ মনে থাকে। তাই ঘুমোতে ওদের মদ খেতে হয় না।

রঞ্জন॥ ঠিক বলেছো সোনালী। একবার পুলিশের তাড়া খেয়ে সারাদিন ছুটোছুটি করেছি। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছি একটা স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে। তখন খুব ক্লান্ত। শরীর যেন আর চলছেই না। ফাঁকা বেঞ্চ পেয়েই শুয়ে পড়লাম। একটা আধবয়সী লোক তার বৌকে নিয়ে মেঝেতে ঘুমোচ্ছে আর নাক ডাকছে। আমার কিন্তু সারারাত ঘুমই হোল না—অতো ক্লান্তি সত্ত্বেও।

সোনালী॥ কেন?

রঞ্জন॥ ওই পুণ্যবানের বুড়ী মা ফিকের ব্যথায় সারারাত কাঁতরালো। আমি তখন কিছুতেই মার মুখ মনে করতে পারিনি। কতো চেষ্টা করলুম। অথচ ওই ব্যাটা পুণ্যাত্মা—মাকে শিয়রে রেখে সারারাত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুমোলো। (হঠাৎ থেমে)—কি হোল? দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে যে?

সোনালী॥ দূষিত বাতাস বের করে দিতে।

রঞ্জন॥ ওটা বের করেও শেষ করতে পারবে না।

সোনালী॥ আমরা পাপী—তাই না রঞ্জন?

রঞ্জন॥ না। পুণ্যবান। পুণ্যবান বলে আমাদের পেছন পেছন পাপ দৌড়ে বেড়াচ্ছে—কিন্তু কিছুতেই বাঁধতে পারছে না। (একটু থেমে)—কি ব্যাপার! বুড়োটা আসছে না কেন?

সোনালী ॥ আচ্ছা এখন যদি সেই পরমেশবাবু আসেন—কেমন হয় রঞ্জন ?

রঞ্জন ॥ আচ্ছা—এখন যদি পুলিশ আসে—তাহলে কেমন হয় সোনালী ?

[দুজনে হেসে উঠলো।]

রঞ্জন ॥ বেশি চাই না সোনালী। আজকের রাতটুকু মাত্র। তারপর, যা হয় হোক।

সোনালী ॥ তুমি কালকের জন্মে সুখ চাও না ?

রঞ্জন ॥ মাতাল না হয়ে জবাব দিতে পারবো না।

[লোকটা ঘরে ঢুকলো।]

রঞ্জন ॥ কে ?

লোকটা ॥ (কৌতুকে) ভয় নেই। পুলিশ নয়।

রঞ্জন ॥ দেখো বাবা। এ-সময় আবার ছুটোছুটি করতে না হয়। ওদের তো আবার সময়-অসময় জ্ঞান নেই।

লোকটা ॥ ভয় কি ! তোর পকেটে তো ছুরি আছে।

রঞ্জন ॥ এখন ছুরি খুলতে ইচ্ছে হবে না।

[লোকটা খাবার গুছিয়ে দিতে সুরু করলো।]

সোনালী ॥ দিন। আমি গুছিয়ে দিচ্ছি।

লোকটা ॥ খুব ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু থাক্।

সোনালী ॥ থাকবে কেন ? —আমি দিচ্ছি।

লোকটা ॥ না। তোমাদের দুজনকে আজ আমিই খাওয়াবো। এ-জীবনে তো (হঠাৎ সাম্‌লে) এই বদমাস ! এদিকে এগিয়ে আয়।

রঞ্জন ॥ আমরা তিনজনে মিলে এবার একটা ঘর বাঁধবো।

লোকটা ॥ খেতে ব'স্ পরে ঘর বাঁধবি।

রঞ্জন ॥ সত্যি বলছি। ঘর না বাঁধলে কিন্তু সুখ নেই। স্বস্তিতে ঘুমোনো যায় না। দেখো না—যেই ঘুম আসে অমনি চিন্তা হয় —কাল কোথায় ঘুমোবো।

সোনালী ॥ কোথায় ঘর বাঁধবে ?

রঞ্জন ॥ কেন ? —জমিতে।

লোকটা ॥ ঘর বাঁধাব জমি আছে তোর ?

রঞ্জন ॥ —তা তো নেই। তাহলে ?

[তিনজনে হেসে উঠলো।]

রঞ্জন ॥ তবে একটা কাজ কবা যায়। ধরো—আমি অনেক টাকা আয় করলাম। তা দিযে তুমি একটা জমি কিনলে। তারপর সোনালী আর আমি—

[এই সময়ে ওপরের ঘরে জোরে বাজনা বেজে উঠলো। ওদেব নিজেদের কথা ডুবে গেল সেই শব্দে। ওরা কিছু সময় হাত-মুখ নেড়ে কথা বলতে চেষ্টা করেও কাউকে শোনাতে পারলো না। ওব' চুপ করে গেল। কিছু পরে বাজনা থেমে গেল।]

রঞ্জন ॥ দুত্তোর ছাই। ঘর বাঁধার স্বপ্নটা পর্যন্ত ওপবয়ালাব জন্যে বলতে পারবো না —দাও, খেয়ে নিই।

[ওরা খেতে সুরু করলো।]

রঞ্জন ॥ কাল ভোরে সূর্য ওঠার আগেই কিন্তু। আ। আমায় গলা ছেড়ে গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে। —একবার পাল্লা দেবো

নাকি—ঐ ওপরয়ালার সুখ বড়ো—না—আমাদের আনন্দ বেশি!

লোকটা ॥ (হেসে) তোর দেখছি রাতে ঘুমই হবে না।

রঞ্জন ॥ অনেক ঘুমিয়েছি। আজ একটু রাতভোর জেগে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে।

লোকটা ॥ আর কোনদিন রাত জাগিসনি?

রঞ্জন ॥ জেগেছি। তবে সে জেলে যাবার সময়। তাতে আরাম নেই।

লোকটা ॥ বর্বর! নে খা। ওকে বাড়িয়ে দিস। একা খা'স নে।

রঞ্জন ॥ আচ্ছা! আমরা তো যাবো। তোমার জিনিস-পত্তরগুলোর কি হবে?

লোকটা ॥ কিছুই নেই।

রঞ্জন ॥ বাহ্‌বা! বাঁচা গেছে। আরে যাবো যখন, তখন সন্ন্যাসীর মতোই যাবো।

লোকটা ॥ তবে—

রঞ্জন ॥ তবে—

লোকটা ॥ না! কিছু না। (দীর্ঘনিঃশ্বাস—ফেললো)

রঞ্জন ॥ আরে বলোই না কি?

লোকটা ॥ শুধু একটা কাজ বাকি রইলো।

রঞ্জন ॥ কি কাজ?

লোকটা ॥ (দূরের ছবিটা দেখিয়ে) ওটাকে খোদাই করছিলাম। —আর হোল না।

রঞ্জন ॥ তাহলে? —কি হবে?

লোকটা॥ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সারাটা জীবনই তো আমার অসম্পূর্ণ। —ওতে আর দুঃখ পাইনে। (গুঁড়িটার কাছে গেল)—প্রায় শেষ করে এনেছিলাম।

রঞ্জন॥ বাকি কতটা ?

লোকটা॥ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। —ও আর হোল না।

রঞ্জন॥ এখনো প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারোনি। কেমন শিল্পী তুমি ?

লোকটা॥ একেবারেই ব্যর্থ।

রঞ্জন॥ হ্যাঁ, অনেকটা আমাদের বিধাতার মতো।

সোনালী॥ কার মূর্তি খোদাই করছেন ?

[সোনালী কাছে গেল।]

লোকটা॥ উ। —কি জানি। আমি চিনি না।

সোনালী॥ চেনেন না।

লোকটা॥ অনেকদিন আগে তাকে আমি দেখেছিলাম। —সুন্দর ফুটফুটে একটা শিশু.. যেন স্বর্গের সুষমা তার মধ্যে... আমার বুক জুড়ে সে থাকতো আর কেউ ছিল না কেউ না . শুধু সেই ছোট্ট আনন্দ... আর এই বুভুক্ষু ভিক্ষুক · আর কেউ নয় —(দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়লো)।

[দূরে হল্লা উঠলো। বোমা ফাটাবার শব্দ। রঞ্জন চমকে উঠলো।]

সোনালী॥ তারপর— ?

লোকটা॥ আমি তখন ভাবতাম—আমার সঙ্গে স্বর্গের বুঝি কোন ব্যবধান নেই। আমি যেন সর্বক্ষণ একটা আলোর মধ্যে ডুবে রয়েছি। যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্রাটের চাইতেও আমি ভাগ্যবান।

রঞ্জন ॥ বাইরে কিসের একটা গোলমাল হচ্ছে।

[সোনালী ও লোকটা খেয়াল করলো না।
তারা যেন ভাব-রাজ্যে বিভোর।]

লোকটা ॥ বিশ্বাস করতাম—আমার জীবনের সিদ্ধি ওরই মধ্যে—ওই আমার পরিপূর্ণতা—কিন্তু—

রঞ্জন ॥ কোলাহল যেন এদিকেই আসছে।

[রঞ্জন চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ালো।]

লোকটা ॥ কিন্তু সে যে কতো বড়ো মিথ্যে তার প্রমাণ আজ পর্যন্ত বহন করে এসেও কূল পাচ্ছিনে।

রঞ্জন ॥ তোমরা ব'সো। আমি দেখে আসি

[রঞ্জন দ্রুত বেরিয়ে গেল।]

সোনালী ॥ তারপর— ?

লোকটা ॥ তারপর ? —তারপর—না থাক। তারপর—আর জিজ্ঞেস করিস নে মা। আমি বলতে পারবো না।—

[অভিভূত লোকটা। সোনালী খোদাই
করা মূর্তিটা দেখতে থাকলো।]

লোকটা ॥ তারপরের কথা বলতে গেলে আমি পাগল হয়ে যাই। —আমার বুকটা ভেঙে-চুরে একাকার হয়ে যায়—

[খোদাই করা মূর্তি দেখে কেঁপে উঠলো
সোনালী। দৌড়ে তুলে নিল ছবিটা।]

লোকটা তারপর সেই স্বর্গের সুষমা—নরকের কীট হয়ে কুলটা হোল—

সোনালী ॥ বাবা! (সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চিৎকার করে উঠলো সোনালী)

[হঠাৎ 'বাবা' ডাকে সমস্ত দেহটায় ঝাঁকুনি খেল লোকটা। দ্রুত আলো তুলে দেখতে থাকলো সোনালীকে। সে কাঁপছে থর থর করে। চোখ—নাক—কপাল—ভ্রূ। ক্রমশঃ লোকটার চোখ রক্তবর্ণ, দেহের শিরা স্ফীত—মুখের ভঙ্গী ও চোখের চাউনি ভয়ংকর হয়ে উঠতে থাকলো। হঠাৎ প্রচণ্ড আবেগে সোনালীর গলা চেপে ধরলো।]

লোকটা॥ তুই—! তোকে আমি একেবারে শেষ করে দেবো সর্বনাশী—

[আবেগের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ধাক্কা দিল সোনালীকে। সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।]

সোনালী॥ আমাকে মেরে ফেলে একেবারে শেষ করে দাও। আমি চাই না—বাবা! তুমি বিশ্বাস করো—

[পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়তে গেলেই লোকটা ছুটে গেল খোদাই করা মূর্তিটার কাছে। তাকে যেন আড়াল করে দাঁড়ালো।]

লোকটা॥ খবরদার—! এদিকে আসবি নি। আমি তোকে খুন করে ফেলবো—আমার কাছে আসবি নি—ছুঁসনে আমাকে—আমি তোকে—

সোনালী ॥ (পায়ে পড়ে) বাবা তাই করো। তাই করো বাবা—

নেপথ্যে রঞ্জন ॥ সোনালী—শীগ্‌গীর বেরিয়ে এসো। ওরা আসছে —পালাতে হবে—

লোকটা ॥ তোকে আমি কি করবো! তুই আমার—আমার আত্মজা! আমার লজ্জা, আমার ঘৃণা, আমার আনন্দ!

[বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো সোনালীকে।]

নেপথ্যে রঞ্জন ॥ সোনালী—সোনালী—সোনা—

[উর্ধশ্বাসে ছুটে এসেই রঞ্জন থমকে দাঁড়ায়। লোকটার নির্মম আলিঙ্গনে সোনালী আবদ্ধ। যেন আদিকালের নব ও নারী। মুহূর্তে প্রলয় ঘটে গেল রঞ্জনের মধ্যে। বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার মাথায় আঘাত করলো রঞ্জন। লোকটা মাটিতে পড়ে গেল। আবার তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হতেই সোনালী রঞ্জনের পায়ে লুটিয়ে পড়লো।]

সোনালী ॥ বাবা—(সোনালী জ্ঞানহারা হোল, রঞ্জন বিমূঢ়।)

নেপথ্যে কোলাহল ॥ এই ঘরে আছে—খুব সাবধান—বন্দুক ঠিক রাখো —ধরতেই হবে—পালিয়ে যেতে না পারে—বাড়িটা ঘিরে ফেলো-

[রক্তাক্ত মাথা নিয়ে টলতে টলতে লোকটা রঞ্জনের কাছে এলো।]

লোকটা ॥ পালা—! শীগ্‌গীর পালা তোরা রঞ্জন। রঞ্জন—

রঞ্জন ॥ না।

লোকটা। তোদের বাঁচতে হবে রঞ্জন।

রঞ্জন॥ না।

লোকটা॥ রঞ্জন—আমার সোনালীকে নিয়ে তুই বাঁচ্।

[জোরে ঝাঁকুনি দিল রঞ্জনকে। রঞ্জনের জ্ঞান যেন ফিরে এলো। লোকটা দৌড়ে দরজা চেপে ধরলো]

লোকটা॥ (চিৎকার করে) রঞ্জন·· ··· ।

রঞ্জন॥ সব পথ ওরা ঘিরে ফেলেছে। কোনদিকে যাবো?

লোকটা। ওপরে উঠে য . .

[রঞ্জন ছুটে গিয়ে অর্ধচেতন সোনালীকে ওপরে জাপটে ধরে শুঁড়িটার কাছে চলে গেল। কোলাহল এসে ধাক্কা দিতে থাকলো দরজায়। লোকটা প্রাণপণে চেপে ধরলো দরজা। রঞ্জন কিছুতেই শুঁড়িটায় পা রেখে ওপরে উঠতে পারছে না।]

রঞ্জন॥ আমি পারছি না। ওপরে উঠতে পারছি না আমি

লোকটা॥ তোকে পারতেই হবে রঞ্জন। (গর্জে উঠলো যেন)

রঞ্জন॥ পারছি না···কি করে উঠবো- ?

[এবার লোকটা দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে এসে শুঁড়িটা দুহাতে জড়িয়ে ধরলো।]

লোকটা॥ এবার আমাকে সিঁড়ি কর রঞ্জন

[রঞ্জন মুহূর্ত দেরি না করেই লোকটার কাঁধের ওপর ভর দিয়ে সোনালীকে নিয়ে ওপরে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হ্যারিকেন

লণ্ঠনটা উল্‌টে পড়ে নিভে গেল। ঘরখানা গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল।]

নেপথ্যে জনতা ॥ ভেঙে ফেলো···ধাক্কা দাও...দরজা ভেঙে ফেলো... জোরে···আরও জোরে...আরো জোরে ধাক্কা দাও······

[হুড়মুড় করে দরজা ভেঙে একদল হিংস্র লোক ঢুকে পড়লো ঘরে। অন্ধকারের মধ্যে ওরা যেন একে অপরকে ধাক্কা দিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ালো। ততক্ষণে রঞ্জন সোনালীকে নিয়ে ওপরের পথ বেয়ে চলে গেছে।]

জনতা ॥ আলো···আলো জ্বালো······অন্ধকার—তাড়াতাড়ি আলো জ্বালো......

[সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো জ্বাললো ওদের মধ্যে কেউ। এবং সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো ওরা।

গাছের গুঁড়িতে খোদাই করা অর্ধসমাপ্ত কিশোরী মূর্তিটা বুকের মধ্যে আগলে রেখে পড়ে রয়েছে লোকটা। তার দেহ প্রাণহীন।

অকস্মাৎ সমস্ত ঘর জুড়ে যেন আলোর বন্যা বয়ে গেল।

রাস্তায় তখন বিউগিল-ড্রাম বাজিয়ে জীবনের জয়গানের মিছিল চলেছে।]

"রূপ কথা" প্রযোজিত

"সিঁড়ি" নাটকের

শিল্পী-পরিচিতি

প্রথম অভিনয় রজনী ॥ ২৭শে ডিসেম্বর, '৬৮ মুক্ত অঙ্গন

মঞ্চে

লোকটা	॥	বাসস মিত্র
রঞ্জন	॥	সুকুমার চৌধুরী
পরমেশ	॥	বিকাশ মুখার্জী
হবনাথ	॥	রনজিত মুখার্জী
পুলিশ	॥	সন্তোষ ভট্টাচার্য
জনতা		
প্রথম	॥	তুষার ঘোষাল
দ্বিতীয়	॥	অজিত সরকার
তৃতীয়	॥	দেবাশীষ মিত্র
পুঃ সার্জেন্ট	॥	জীবন কুণ্ডু
সোনালী	॥	শেলী পাল

অন্তরালে

নির্দেশনা ও		
মঞ্চ পরিকল্পনায়	॥	হরেন মল্লিক
সংগীত	॥	সৌরেন গুপ্ত
আলো	॥	স্বরূপ মুখোপাধ্যায়
সহযোগিতায়	॥	তুষার ঘোষাল, বৈদ্যনাথ নন্দী, পঞ্চানন দলুই, হরবোলা
ব্যবস্থাপনায়	॥	নিত্যানন্দ পণ্ডিত